উপন্যাস

ফুল চোর

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. হারমোনিয়াম সম্পর্কে........................... 2

২. কাটুসোনা 12

৩. পাগলা দাশু........................... 23

৪. কাটুসোনা 37

৫. পাগলা দাশু........................... 49

৬. কাটুসোনা 60

৭. পাগলা দাশু........................... 72

৮. কাটুসোনা 89

৯. পাগলা দাশু........................... 102

১০. কাটুসোনা 112

১১. পাগলা দাশু........................... 123

১. হারমোনিয়াম সম্পর্কে

হারমোনিয়াম সম্পর্কে আমি কতটুকুই বা জানি! তবু এদের বাড়ির পুরনো হারমোনিয়ামটা দেখেই আমার মনে হচ্ছিল, শুধু রিড নয়, এর গায়ের কাঠের কাঠামোটাও নড়বড়ে হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলার বয়স খুব বেশি হবে না। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রোগা, ফরসা। এবং মুখের হাড় প্রকট হওয়ায় একটু খিটখিটে চেহারার। বললেন, রিডগুলো জার্মান।

পাশের ঘরে একটা বাচ্চা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পশুপতি আমাকে কনুইয়ের একটা তো দিল। সম্ভবত কোনও ইশারা। কিন্তু কীসের ইশারা তা আমি ধরতে পারলাম না। এই হারমোনিয়াম নোর ব্যাপারে সে-ই অবশ্য দালালি করছে।

আমি মাদুরের ওপর রাখা হারমোনিয়ামটার সামনেই বসে আছি। আমার সামনে চায়ের কাপ, ডিশে দুটো থিন এরারুট বিস্কুট। আমি ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে বললাম, ও।

কিন্তু আসলে আমি তখন হারমোনিয়ামের রিডের চেয়ে থিন এরারুট বিস্কুট সম্পর্কেই বেশি ভাবছি। হঠাৎ আমার খেয়াল হয়েছে, এরারুট দিয়ে সম্ভবত এই বিস্কুট তৈরি হয় না। যতদুর মনে পড়ে, ছেলেবেলা থেকেই থিন এরারুট বিস্কুট কথাটা শুনে আসছি। অথচ কোনও দিনই থিন কথাটা বা এরারুট ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি। আজ পুরনো হারমোনিয়াম নিতে এসে ভাবতে লাগলাম।

যথেষ্টই আপ্যায়ন করছেন এরা। কেউ পুরনো হারমোনিয়াম কিনতে এলে তাকে হাতপাখার বাতাস বা চা বিস্কুট দেওয়ার নিয়ম আছে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু চা বিস্কুট দেওয়াতে আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি কনে দেখতে এসেছি! এক্ষুনি ও-ঘর

থেকে পরদা সরিয়ে কনে ঢুকবে। নিয়মমাফিক নমস্কার করবে এবং হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত বা নজরুলগীতি গাইবে।

ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামটার ওধারে বসে আছেন। মুখ চোখ যথেষ্ট ধূর্ত এবং সচেতন। হাতের পাখাটা জোরে নাড়তে নাড়তে একটু বুকে বললেন, চা ঠান্ডা হচ্ছে যে!

ঠান্ডা হওয়াটাই দরকার ছিল। এবার বড় প্যাঁচপ্যাঁচে গরম পড়েছে। ঘরে ইলেকট্রিক পাখা নেই। হাতপাখায় তেমন জুতও হচ্ছে না। এর মধ্যে গরম চা পেটে গেলে আরও অস্বস্তি।

ভদ্রতাবশে আমি চায়ে চুমুক দিলাম। এবং সেই সময়ে বেটাইমে পশুপতি আমাকে কনুই দিয়ে আর একটা ঠেলা দিল। খুব সাবধানেই দিল। চা চলকায়নি। কিন্তু আমি দ্বিতীয়বারও ইঙ্গিতটা ধরতে না পেরে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। পাশের ঘরে কঁদুনে মেয়েটাকে কে এক জন ফিসফিস করে মন-ভোলানো কথা বলছে। গলাটা পুরুষের বলেই মনে হচ্ছিল। অথচ ভদ্রমহিলা বলেছে, তার স্বামী বাড়ি নেই। অবশ্য পাকা ঘর হলে পাশের ঘরের কথা এ-ঘর থেকে শুনতে পাওয়া যায় না। মাঝখানের দরজাটা শক্ত করে আটা রয়েছে। কিন্তু বাঁশের বেড়ার ঘরে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই মুশকিল।

পাশের ঘরে মেয়েটা বলছে, ছাই দেবে তুমি। কত কিছু তো কিনে দেবে বলে। দাও?

ফিসফিস স্বরে বলে, আস্তে। শুনতে পেলে কী মনে করবে। ডবল রিডের ভাল হারমোনিয়াম দেখে এসেছি। কী আওয়াজ।

চাই না। পুরনোই আমার ভাল।

এটা তো পচা জিনিস ছিল, তাই বেচে দিচ্ছি।

সব জানি। মিথ্যে কথা।

আমাকে কানখাড়া করে শুনতে দেখেই বোধ হয় ভদ্রমহিলা সতর্ক হলেন। খুব জোর দু' ঝাপটা হাওয়া মেরে আমার কান থেকে কথাগুলো তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বললেন, কত লোক আসে। দেখেই বলে, এমন জিনিস আজকাল পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। বেচে দেওয়ার ইচ্ছেও ছিল না, কিন্তু আমার বড় মেয়ে এখন সংগীত প্রভাকর পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তো, তাই স্কেল চেঞ্জার না হলে ভারী অসুবিধে।

আমি বললাম, ঠিক কথাই তো।

হারমোনিয়ামের একটা রিডের তলায় একটা দেশলাইয়ের কাঠি গোঁজা দেখে আমি কৌতূহলবশে এবং সম্ভবত কান চুলকোনোর জন্যই আনমনে দু আঙুলে সেটা টেনে আনলাম। সঙ্গে সঙ্গে রিডটা নড়া দাঁতের মতো ডেবে গেল। অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ রকমই হওয়ার কথা।

রিডটার নেমকহারামি লক্ষ করেই কিনা কে জানে, ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বললেন, চা-টা কিন্তু সত্যিই জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি চা খেতে থাকি। কিন্তু কেবলই মন বলছে, কনে কোথায়? কনে কোথায়?

আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। গ্রীষ্মের শেষ বেলার আলোটা বেশ মোলায়েম লালচে হয়ে পশ্চিমের জানালা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে। ভারী কিভূত আলো! সামনে হারমোনিয়াম। পরিবেশটা একদম হুবহু কনে দেখার। পরদা সরিয়ে কনে ঘরে এলেই হয়।

এল না। পশুপতি এবার হাঁটু দিয়ে আমার হাঁটুতে চাপ দিল। আমি ধীরে সুস্থে চা শেষ করি।

বিস্কুটটা খেলেন না যে!–ভদ্রমহিলা খুবই আকুল হয়ে বললেন।

ডিশে চা পড়ে বিস্কুটটা ভিজে নেতিয়ে গেছে। ওই ক্যাতক্যাতে বিস্কুট খেতে আমার ভারী ঘেন্না হয়। কিন্তু সে কথা তো বলা যায় না। তাই আমি বললাম, চায়ের সঙ্গে কিছু খাইনা।

পশুপতি এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিল! এবার হঠাৎ বলে উঠল, বউদি, আপনার গানের গলা কিন্তু দারুণ ছিল।

আর গলা! –বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা।

আমি যে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড হারমোনিয়াম কিনতে এসেছি সেটা ভুলে গিয়ে কখন যে খোলা দরজার সরে যাওয়া পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেছি তা খেয়ালই ছিল না। অদ্ভুত লালচে গাঢ় আলোয় সামনের বাগানটা মাখামাখি। এইমাত্র কয়েকটা বেলকুঁড়ি বুঝি ফুল হয়ে ফুটল। একটা দমকা বাতাসে চেনা দুরন্ত গন্ধটা এসে মাতাল করে দিয়ে গেল ঘর। আমরা নিচু ভিটের মেঝেয় মাদুরে বসা। ঘরের একধারে একটা সরু বেঞ্চির মতো চৌকিতে রং-ওঠা নীল বেডকভারে ঢাকা বিছানা। একটা সস্তা কাঠের আলমারি। একটা পড়ার টেবিল আর লোহার চেয়ার। বেড়ার বাঁখারির ফাঁকে ফাঁকে চিরুনি, কাঠের তাক, নতুন কাপড় থেকে তুলে নেওয়া ছবিওলা লেবেল, সিগারেটের প্যাকেট কেটে তৈরি করা মালা, কাজললতা এবং আরও বহু কিছু গোঁজা রয়েছে। ঘরের কোণে একটা কাঠের মই রয়েছে যা বেয়ে পাটাতনে ওঠা যায়। এ সব তেমন দ্রষ্টব্য বস্তু নয়। তবু ওই বেলফুলের গন্ধ, এক চিলতে বাগান আর লালে লাল আলো পুরো 'হোলি হায়, হোলি হ্যায়' ভাব। মন বার বার বিয়ে-পাগলা বরের মতো জিজ্ঞেস করছে, কনে কোথায়? কনে কোথায়?

আমার অন্যমনস্কতার ফাঁকে পশুপতি আর ভদ্রমহিলার মধ্যে বেশ কিছু কথা চালাচালি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। না হলে হঠাৎ কেনই বা ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে পা পা করে বাজাতে থাকবেন, আর কেনই বা মিনিট পাঁচেক খামোকা হারমোনিয়ামে নানা গৎ খেলিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলবেন, এই করেছ ভাল নিঠুর হে...

গান শেষ হলে কিছু বলতে হয় বলে বললাম, বেশ।

ভদ্রমহিলা ঝুঁকে বললেন, ভাল না আওয়াজটা?

আমার দুটো আওয়াজই বেশ স্পষ্ট ও জোরালো লেগেছিল। তাই বললাম, ভালই তো। এখনও আপনার গলা বেশ রেওয়াজি।

সময় কোথায় পাই বলুন! সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, সেই থেকে সংসার আর সংসার। এখন মেয়েদের শেখানোর জন্য যা একটু বসি টসি মাঝে-মাঝে। আমার উনি একদম গান বাজনা ভালবাসতেন না। ঘরের লোক মুখ ফিরিয়ে থাকলে কি চর্চা রাখা যায় বলুন!

ঠিকই তো।

পশুপতি খুব হাসছিল। হাসি ওর রোগ বিশেষ। তবে হঠাৎ হাসিটা সামলে বলে উঠতে পারল, তা হলে এবার কাজের কথা থোক।

ভদ্রমহিলা ভীষণ গম্ভীর হয়ে মুখ নামিয়ে পাখার উঁচু-নিচু শিরগুলোয় আঙুল বোলাতে-বোলাতে বললেন, আপনারাই বলুন। জার্মান রিড, পুরনো সাবেকি জিনিস। দেখতে তেমন কিছু নয় বটে, কিন্তু এখনও কী রকম সুরেলা আওয়াজ, শুনলেন তো!

এবার সেই বিপজ্জনক দরাদরির ব্যাপারটা এগিয়ে আসছে। আমি তাই প্রাণপণে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। ফুলের গন্ধ ও কনে দেখা আলোর স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মৃদু মৃদু। হাসতে থাকি। তবু দুনিয়ার যত ছিদ্র আমার চোখে পড়বেই। ভদ্রমহিলা হারমোনিয়ামের বেলোটা চেপে বন্ধ করেননি। ফলে আমি স্পষ্ট দেখলাম বেলোর ভিতরে দু'জায়গায় ব্ল্যাক টেপের পট্টি সাঁটা রয়েছে।

দরাদরির সময় পশুপতি কোন পক্ষ নেবে তা বলা মুশকিল। হারমোনিয়ামটা কিনতে সেই আমাকে রাজি করিয়েছে। বলেছে, জিনিসটা ভাল, পরে বেশি দামে বেচে দেওয়া যাবে। আমার টাকা থাকলে আমিই কিনতুম। আর আপনি যদি কেনেন তবে আমি পরে দশ-বিশ টাকা বেশি দিয়ে আপনার কাছ থেকেই নিয়ে নেব। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পশুপতি

বিক্রেতাদের কাছ থেকেই কমিশন পায়, ক্রেতাদের কাছ থেকে বড় একটা নয়। সুতরাং ভদ্রমহিলার পক্ষ নেওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিকই যদি হারমোনিয়ামটা বাগানোই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে দর কমানোতেই তার স্বার্থ। কিন্তু পশুপতিকে ঠিক মতো আঁচ করা খুবই শক্ত।

ভদ্রমহিলা নতমুখ ফের তুলে আমার দিকে পাগলকরা এক দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আর একটা গান শুনব।

কথাটা মাথায় আসতে আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দরাদরি জিনিসটা আমি একদম পছন্দ করি না।

গানের কথায় ভদ্রমহিলা একটু খুশিই হলেন কি! মুখটা যেন জ্যোৎস্নায় ভিজে গেল। বললেন, আমার গান আর কী শুনবেন। আমার বড় মেয়ে বাড়িতে থাকলে তার গান শুনিয়ে দিতাম। দারুণ গায়।

আমি নির্লজ্জের মতো জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বড় মেয়ে কোথায়?

রবিবারে ওর গানের ক্লাস থাকে।

পাশের ঘরে কান্না থেমেছে। তবে একটা কচি মেয়ের গলা আর একটা ধেড়ে পুরুষের গলা খুব জোর ফিসফিসিয়ে গল্প করছে। আমার মনে হল, আজ রবিবারে ভদ্রমহিলার স্বামী বোধ হয় বাড়িতেই আছেন। তবে সম্ভবত উনি আমার সেভোকাকার মতোই মেনিমুখো এবং স্ত্রীর অধীন। বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজওয়ালা, শিশিবোতলওয়ালা, ছুরি কাঁচি শানওয়ালা, শিলোকোটাওয়ালা, কাপড়ওয়ালা বা শালওয়ালা এলে কাকিমা কক্ষনও কাকাকে তাদের সামনে বেরোতে দেন না। কারণ ভালমানুষ কাকা সকলের সব কথাই বিশ্বাস করে বসেন, দর তুলতে বা নামাতে পারেন না এবং ঝগড়া-টগড়া লাগলে ভীষণভাবে ল্যাজেগোবরে হয়ে যান। এমনকী আমার খুড়তুতো বোনকে যখন পাত্রপক্ষ

দেখতে এসেছিল তখনও কাকাকে ঠিক এইভাবে পাশের ঘরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, যেমনভাবে এই ভদ্রমহিলার স্বামীকে রাখা হয়েছে। পাত্রপক্ষ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কাকা পাশের ঘরে বসে প্লাস পাওয়ারের চশমা এঁটে প্রায় তিন কিলো চালের ধান আর কঁকর বেছে ফেলেছিলেন। এই ভদ্রলোককে তেমন কোনও কাজ দেওয়া হয়েছে কি না কে জানে!

তবে ভদ্রলোকের জন্য আমার বেশ মায়া হচ্ছিল। ওঁর করুণ অবস্থাটা আমি এত স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম যে বেখেয়ালে হঠাৎ বলেই ফেললাম, আপনার স্বামীকেও এই ঘরে ডাকুন না।

ভদ্রমহিলা ফরসা এবং ফ্যাকাসে। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি রক্তাল্পতায় ভুগছেন। কিন্তু আমার কথা শুনে হঠাৎ এমন রাঙা হয়ে উঠলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমার ধারণা ভুল। ওঁর রক্তাল্পতা থাকতেই পারে না।

উনি ফের মুখ নত করলেন এবং আবার মুখ তুলে বললেন, উনি তো বাড়িতে নেই। তবে হয়তো ফিরে আসতেও পারেন। লাজুক মানুষ লোকজ দেখে হয়তো পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকেছেন। ও ঘরে কথাও শুনছি বেশ।

বলতে বলতে ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। মাঝখানের দরজা এতক্ষণ দমবন্ধ করে এঁটে ছিল। এবার হঠাৎ খুলে যাওয়ায় অবারিত স্বাসবায়ুতে সারা বাড়িটা খোলামেলা, হাসিখুশি হয়ে গেল হঠাৎ। আর ঘরে কনে-দেখা আলোয় ভদ্রমহিলা অবিকল কনের মতোই লুঙ্গি পরা আদুড়ে গায়ের মাঝবয়সি মজবুত চেহারার লাজুক স্বামীটিকে ধরে ধরে এনে দাঁড় করাল। খুব হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছিলাম। দেখুন, চুপি চুপি এসে পাশের ঘরে মেয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। মেয়ে অন্ত প্রাণ একেবারে।

ভদ্রলোক মাথা চুলকোতে চুলকোতে খুব বিনয় ও লজ্জার সঙ্গে হাসছেন। জীবনে অসফল ভদ্রলোকেরা ঠিক এইভাবেই হাসেন এবং নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন। অবিকল আমার সেজোকাকা।

বসুন। আমি বললাম।

মাদুরে আর জায়গা ছিল না। উনি অবশ্য মাদুর-টাদুরের তোয়াক্কা করেন বলে মনে হল না। খুব অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেঝেয় বাবু হয়ে বসে পড়লেন।

এই সময়ে পশুপতি খুব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে, কাজের কথাটা তুলুন না।

কনে কই? আমার মন তার দাবি আবার পেশ করল। আমি বললাম, মেয়েদেরও ডাকুন।

পরদার ফাঁক দিয়ে একটা কচিমুখ উঁকি দিয়েই ছিল, সে-ই জবাব দিল, দিদি সুধাদির বাড়িতে আছে। ডেকে আনব?

ভদ্রমহিলার রক্তাল্পতা কেটে গিয়ে রক্তাধিক্যই দেখা যাচ্ছে এখন। কিন্তু তুখোড় চালাক বলে পলকে হেসে ফেলে বললেন, ওমা। তাই বুঝি! আমাকে তো বলে গেল গানের ক্লাসে যাচ্ছে। তা আন না ডেকে।

মেয়েটা ঘরের ভিতর দিয়েই এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল! পশুপতি ঘাম মুছছে। ভদ্রমহিলা করুণ চোখে চেয়ে বললেন, দেরি হয়ে গেছে বলে বোধ হয় আজ আর গানের ক্লাসে যায়নি।

পশুপতি ঘামভেজা রুমালটা শুকোনোর জন্য মাদুরের ওপর পেতে দিয়ে বলল, এবার কাজের কথাটা হয়ে যাক।

আপনারাই বলুন। ভদ্রমহিলা বললেন, জিনিসটা ঘরের বার করার ইচ্ছে কারও নেই। মেয়েরা তো সারাক্ষণ কিটমিট করছে। কিন্তু আমি বলি, স্কেল চেঞ্জার যখন কেনা হচ্ছেই তখন আর একটা হারমোনিয়াম ঘরে রেখে জঞ্জাল বাড়ানো কেন।

এ সবই দরের ইংগিত। কিন্তু পুরনো বা নতুন কোনও হারমোনিয়ামের দর সম্পর্কেই আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে পশুপতি বলেছিল, প্রথমে পঞ্চাশ বলবেন। ধীরে ধীরে পঁচাত্তর অবধি উঠে একদম থেমে যানে।

কিন্তু হারমোনিয়ামটার দিকে না তাকিয়ে কেবল ঘরদোর এবং লোকজনের দিকে চেয়েই পঞ্চাশ টাকা বলতে আমার কেমন বাধোবাধো ঠেকছে।

এ সময়ে ভদ্রমহিলা ডুবন্ত মানুষের দিকে একটা লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, পাঁচশো টাকায় কেনা জিনিস।

দরাদরিতে দালালের কথা বলার নিয়ম নেই। তা হলে তার পক্ষপাত প্রকাশ পাবে। পশুপতি শুধু শ্বাস নেওয়া আর ছাড়াটা বন্ধ করে ছিল। ফলে ঘরে একটা গর্ভিনী নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হল। প্রচণ্ড টেনশন। দামের কথাটা এখন কে তুলবে?

নিস্তব্ধতা ভেঙে আমি হঠাৎ বললাম, আমি গান জানি না।

ভদ্রমহিলা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। কথাটার অর্থ বুঝলেন না বোধ হয়।

আমি তাই মৃদু হেসে বললাম, গান না জানলেও হারমোনিয়াম ঘরে রাখার নিশ্চয়ই কিছু-কিছু উপকারিতা আছে।

ভদ্রমহিলা তুখোড় হলেও এ ধরনের কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত নন। কনে দেখতে এসে কেউ যদি বলে, আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, তবে যেমনটা হয় আর কি!

উনি তাই বললেন, গান না জানলে হারমোনিয়াম দিয়ে কী করবেন? কিন্তু তা হলে কিনছেনই, বা কেন?

যদি শিখি?

ভদ্রমহিলা একটু নড়ে চড়ে বসে বললেন, সে তো খুব ভাল কথা। শিখতে গেলে হারমোনিয়াম ছাড়া কিছুতেই হবে না।

কিন্তু কে শেখাবে সেইটেই সমস্যা। আমি মুখ চুন করে বলি, একদম বিগিনারকে শেখানোর তো অনেক ঝামেলা। তা ছাড়া আমার কোনও সুরজ্ঞান নেই।

ভদ্রমহিলা ডগমগ হয়ে বলেন, ও নিয়ে আপনাকে মোটেই ভাবতে হবে না। আমিই শেখাব।

আপনি? আপনার তো সংসার করে বাড়তি সময়ই নেই।

সপ্তাহে এক দিন বা দু' দিন শেখালেই যথেষ্ট। বাদ বাকি দিনগুলোয় আপনি বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন!

বাইরের দরজার পরদা সরিয়ে এ সময়ে স্নানমুখী একটি মেয়ে ঢুকল। আর সে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরটার যা কিছু খাকতি ছিল, তার পূরণ হয়ে গেল। কনে-দেখা আলো, পুষ্পগন্ধ, রঙ্গমঞ্চের সব সাজ এবং একা ও দুঃখী হারমোনিয়াম সবই সজীব ও অর্থবহ হয়ে উঠল। মন বলল, এইজন্যই তো এতক্ষণ বসে থাকা। অবশেষে কনে এল।

২. কাটুসোনা

কাটুসোনা

কাল রাতে আমাদের বাড়িতে চোর এসেছিল। মাগো! ভাবতেই ভয় করে। গায়ে কাঁটা দেয়। সবচেয়ে বেশি ভয় ভূতকে আর চোরকে।

আমাদের একটা লোমওয়ালা সুন্দর ভুটিয়া কুকুর ছিল। তার নাম পপি। ছোটখাটো, ভুসকো রঙের, ভারী মিষ্টি দেখতে। ভুক ভুক করে যখন ডাকত তখন ডাকটাও মিষ্টি শোনাত। সেই ছোট্ট একটু কুকুরছানা অবস্থায় আমাদের বাড়িতে আনা হয়েছিল তাকে। আমিও তখন ছোট্ট একটুখানি। টানা বারো বছর আমাদের সঙ্গেই সে বড় হল, বুড়ো হল। তারপর এই তো গেলবার শীতের শেষ টানে মরে গেল একদিন। পপির জন্য আজও বুকের কান্না সব শেষ হয়নি। ভাবলেই কান্না পায়। কেন যে কুকুরের পরমায়ু এত কম! আমি তো এখনও ভাল করে যুবতীও হয়ে উঠিনি, এর মধ্যেই পপি বুড়ো হয়ে মরে গেল!

তা যাই হোক, পপির মতো এত নিরীহ কুকুর হয় না। কোনও দিন কাউকে কামড়ায়নি, রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে মারপিট করেনি। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকতে ভালবাসত। তবে ভুক ভুক করে ডাক ছাড়ত ঠিকই। আর তার ভয়েই গত বারো বছরে কোনও দিন আমাদের বাড়িতে চোর আসেনি। পপি মরবার পর এ পর্যন্ত কম করেও দশ-বারো বার চোর হানা দিয়েছে।

কাল রাতের চোরটাকে বাঁটুল দেখেছে। ঠাকুমার কাছে বাঁটুল আর চিনি শোয়। বাঁটুলের ভয়ংকর কৃমির উৎপাত। সারা রাত দাঁত কড়মড় করে। গতবারেও তার গলা দিয়ে এত বড় কেঁচো বেরিয়েছিল। মাঝে-মাঝে সে বিছানায় ছোট-বাইরে করে ফেলে। সেও নাকি কৃমির জন্যই। কাল মাঝরাতে ছোট-বাইরে পাওয়ায় কোন ভাগ্যিতে তার ঘুম ভেঙেছিল। সলতে কমানো হ্যারিকেনের অল্প আলোয় সে দেখতে পায় একটা লম্বা বাঁখারি জানালা

দিয়ে ঘরে ঢুকে আলনা থেকে ঠাকুমার থানধুতিটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বাঁটুল ভয়ে আধমরা অবস্থায় চোখ মিটমিটিয়ে জানালার দিকে চেয়ে দ্যাখে, একটা লোক। কেমন লোক, রোগা না মোটা, কালো না ফরসা, লম্বা না বেঁটে তার কিছুই বলতে পারেনি। শুধু একটা লোককে সে দেখেছে। ওই অবস্থায় আমি হলে ভয়ে জানালার দিকে চাইতামই না। কড়াক্কর করে চোখ বন্ধ করে রাখতাম। বাঁটুল লোকটাকে দেখে ঠাকুমাকে চিমটি দিয়ে জাগিয়ে দেয়।

ঠাকুমা তো বুঝতে পারেনি কেন বাঁটুল চিমটি কেটেছে। ফলে ঠাকুমা উঃ বলে জেগে উঠে বাটুলকে বকে উঠেছে, এ ছেলেটার সঙ্গে শোওয়াই যায় না। এই হাঁটু দিয়ে গুতোচ্ছে, এই গায়ে পা তুলে দিচ্ছে, এই দাঁত কড়মড় করছে, এখন আবার চিমটিও দিতে শুরু করেছে।

সাড়াশব্দে বাইরের ঘরে ভৈরবকাকা জেগে উঠে গম্ভীর গলায় বলল, কে রে?

চোর কি আর তখন ত্রিসীমানায় থাকে? চোর ধরতে হলে কখনও আওয়াজ দিতে নেই। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে নাকি হঠাৎ সাপটে ধরতে হয়। কিন্তু সে সাহস এ বাড়ির কারও আছে বলে মনে হয় না। তবে মাঝরাতে বেশ একটা হই-হই হল আমাদের বাড়িতে। বাঁটুল চোর কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে প্রথমে ঠাকুমা, তারপর ভৈরবকাকা এবং তারপর ঘুম ভেঙে বাড়ির প্রায় সবাই আতঙ্কে বিকট গলায় চোর! চোর! চোর! চোর! করে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু কেউ দরজা খুলে বেরোয় না। পাড়ার লোক যখন জড়ো হল তখন চোর তার বাড়িতে গিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে।

কিন্তু আমরা বাড়িসুদ্ধ লোক সেই যে জেগে গেলাম তারপর আর সহজে কেউ ঘুমাতে গেল না। আলনা থেকে ঠাকুমার থানধুতি ছাড়া চিনির একটা সোয়েটার আর ভৈরবকাকার একটা পুরনো পাজামা চুরি গেছে। পুরনো পাজামাটার জন্য দুঃখের কিছু নেই, ওটা ঠাকুমা ন্যাতা করবে বলে এনে রেখেছিল। কিন্তু তবু এই চুরি উপলক্ষ করেই বাড়িতে মাঝরাতে সিরিয়াস আলোচনাসভা বসে গেল। এমনকী এক রাউন্ড চা পর্যন্ত হয়ে গেল। সেই চা করতে রান্নাঘরে যেতে হল আমাকেই, সঙ্গে অবশ্য পিসি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভৈরবকা বললেন, চোরেদের নিয়ম হল, চুরি করে গেরস্তবাড়িতে পায়খানা করে যায়।

বাবা বললেন, দূর! ও সব সেকেলে চোরদের নিয়ম।

তবু দেখা যাক।

বলে ভৈরবকাকা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ আর বিরাট লাঠি হাতে বেরোলেন। সঙ্গে আমাকে আর বাঁটুলকে নিলেন। বললেন, আমার চোখ তো আর অত বেশি তেজি নয়। তোরা একটু নজর করতে পারবি।

ভয়ে আমার হাত পা হিম হয়ে আসছিল। বাটুল তার এয়ারগান বগলদাবা করে আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, কোনও ভয় নেই রে মেজদি, এয়ারগানের সামনে পড়লে চোরকে উড়িয়ে দেব।

আমি বললাম, হু! খুব বীর।

টর্চ জ্বেলে ভিতরের মস্ত উঠোন আর বাইরের বাগান খুঁজে দেখা হল। কোথাও সে রকম কিছু পাওয়া গেল না।

তখন ভোর হয়ে আসছে। ভৈরবকাকা বললেন, আর শুয়ে কাজ নেই। চল, মর্নিং ওয়াকটা সেরে আসি।

বেড়িয়ে ফেরার পথে মল্লিকদের বাড়ির বাগানে অনেক বেলফুল দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। ওদের বাড়িতে কুকুর নেই। তাই নিশ্চিন্তে ফটক খুলে ঢুকে এক কোঁচড় বেলকুঁড়ি তুলে ফেললাম। ভিজে ন্যাকড়ায় ঢাকা দিয়ে রাখলে বিকেলে ফুটে মউ মউ করবে গন্ধে। ফুল তুলছি আপনমনে, এমন সময় হঠাৎ বাড়ির ভিতর থেকে একটা বিদঘুঁটে হারমোনিয়ামের শব্দ উঠল। খুব অবাক হয়েছি। এ বাড়িতে গানাদার কেউ নেই হারমোনিয়ামও নেই জানি। তবে?

সারেগামার কোনও রিডেই সুর লাগছে না। সেই সঙ্গে আচমকা একজন পুরুষের গলা বেসুরে মা ধরল। এমন হাসি পেয়েছিল, কী বলব!

ভৈরবকাকা কাকভোরে জাম্বুবানের মতো ফটকের বাইরে লাঠি আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে। হারমোনিয়াম শুনে তিনি বললেন, কাটুসোনা, চলে আয়। বাঁটুল ফুল চুরিতে আগ্রহী নয় বলে একটু এগিয়ে গেছে।

এ বাড়িতে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেও আমার ভয় নেই। বলতে কী এ বাড়িতে আমার কিছু অধিকারও আছে। এ বাড়ির ছোট ছেলে অমিতের সঙ্গে বহুকাল হল আমার বিয়ের কথা ঠিকঠাক। সে আমেরিকা থেকে এক ফাঁকে এসে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। আমিও তৈরি।

ভৈরবকাকা অবশ্য ফুল চুরির ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না। কারণ হবু বউ ভাবী শ্বশুরবাড়িতে ফুল চুরি করতে এসে ধরা পড়লে ব্যাপারটা যদি কেঁচে যায়। তাই উনি তাড়া দিয়ে বললেন, সব জেগে পড়েছে। পালিয়ে আয়। অত ফুল তোর কোন কাজে লাগবে শুনি?

মনে মনে বললাম, মালা গাঁথব।

মুখে বললাম, একটু দাঁড়াও না। এ বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে কে?

কে জানে! তবে ওদের একটা মাথা-পাগলা গোছের ভাই এসেছে কলকাতা থেকে শুনেছি। সে-ই বোধ হয়।

কী রকম ভাই?

সে কত রকম হতে পারে। পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো, জ্ঞাতির কি শেষ আছে! কে জানে?

আমি খুশি হতে পারি না।

হারমোনিয়ামটা তারস্বরে বিকট আওয়াজ ছাড়ছে। সঙ্গে গলাটা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য সুরে। যাকে বলে বেসুরের সঙ্গে বেসুরের লড়াই।

আমি কোঁচড় ভরতি ফুল নিয়ে চলে আসি। ভৈরবকাকাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি দেখেছ লোকটাকে?

লোকটা নয়, ছেলেটা। একেবারে পুঁচকে ছোকরা। টাউন ডেভেলপমেন্টের চাকরি নিয়ে এসেছে। কিছু দিন হল। সে দিন দেখি প্রকাণ্ড একটা পাকা কাঁঠাল নিয়ে বাজার থেকে ফিরছে। পিছনে-পিছনে দুটো গোরু তাড়া করাতে মালগুদামের রাস্তা দিয়ে দৌড় দিচ্ছিল। তাই দেখে সকলে কী হাসাহাসি।

মল্লিকবাড়ি এখন অবশ্য ফাঁকাই থাকে। ছেলেরা সবাই বিদেশ-বিভুয়ে চাকরি করে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকার মধ্যে বুড়ো আর বুড়ি। অবশ্য বুড়োবুড়ি বলতে সাজ্ঘাতিক বুড়োবুড়ি তারা নন। আমার হবু শাশুড়ির চেহারায় এখনও যৌবনের ঢল আছে। হবু শ্বশুরমশাই এখনও বাহান্ন ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে দিনে চার মাইল করে হেঁটে আসেন। দরকার হলে সাইকেলও চালান।

হারমোনিয়ামের শব্দটা বহু দূর পর্যন্ত আমাদের তাড়া করল।

রাস্তার মোড়েই দাঁড়িয়েছিল বাঁটুল। ভৈরবকাকাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে আমি আর বাঁটুল পাশাপাশি হাঁটছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হ্যাঁ রে বাঁটুল, মল্লিকবাড়িতে কে নাকি এসেছে?

হ্যাঁ। পাগলা দাশু।

তার মানে?

অমিতদার ভাই। সবাই তাকে পাগলা দাশু বলে ডাকে।

কেন?

কী জানি? লোকটার একটু ট্যানজিস্টার শর্ট আছে।

বাঁটুলের সব কথাই অমনি। ভাল বোঝা যায় না। তবে একটা আন্দাজ পাওয়া যায় ঠিকই। বললাম, সত্যিকারের পাগল নাকি?

না, না। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রোজ বাঘাযতীন পার্কে ফুটবল খেলতে যায় সে। গোলকিপিং করে। কিন্তু একদম পারে না। বল হয়তো ডান দিক দিয়ে গোলে ঢুকছে, সে বাঁ দিকে ডাইভ দেয়। আমরা হেসে বাঁচি না।

তবে খেলায় নিস কেন?

বাঁটুল গম্ভীর হয়ে বলে, না নিয়ে উপায় আছে? এ পর্যন্ত তিনটে রাশিয়ান টাইপের ফুটবল কিনে দিয়েছে তা জানিস? এক-একটার দাম ষাট-সত্তর টাকা।

ভূত বা চোরের মতো পাগল আর মাতালদেরও আমার ভীষণ ভয়। কিন্তু যারা পুরো পাগল নয়, যারা আধপাগলা খ্যাপাটে ধরনের তাদের আমার কিন্তু মন্দ লাগে না। এই যেমন ভৈরবকাকা। খুঁজে দেখতে গেলে ভৈরবকাকা আমাদের রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়। জ্ঞাতি মাত্র। বিয়ে শাদি করেনি, একা-একা একটা জীবন দিব্যি কাটিয়ে দিল। সাত ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে গত পনেরো-ষোলো বছর আমাদের পরিবারে ঠাই নিয়েছে। বিয়ে না করলে একটা বাই বাতিক হয় মানুষের। সব সময়েই উদ্ভট সব চিন্তা আসে মাথায়। ভৈরবকাকাও তাই। খামখেয়ালি, রাগী, অভিমানী আবার জলের মতো মানুষ। এমন লোককে কার না ভাল লাগে? আমার তো বেশ লাগে। খ্যাপামি না থাকলে মানুষের মধ্যে মজা কই? আমার বাপু বেশি ভাবগম্ভীর হিসেবি লোক তেমন ভাল লাগে না। রবি ঠাকুরের বিশু পাগলা বা ঠাকুরদার মতো চরিত্র আমার বেশি পছন্দ।

আমি বাঁটুলকে জিজ্ঞেস করি, পাগলা দাশু আর কী কী করে?

বাটুল বলে, সে অনেক কাণ্ড। ছুটির দিনে নতুন পাহাড় আবিষ্কার করতে একা-একা চলে যায়। নতুননতুন গাছ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া সাইকেলে চড়া শিখতে গিয়ে রোজ দড়াম-দড়াম করে আছাড় খায়। গান শিখবে বলে লিচুদিদের পুরনো হারমোনিয়ামটা দুশো টাকায় কিনে এনেছে।

দুশো টাকা?– বলে আমি চোখ কপালে তুলি।

লোকটা বোকা আছে মাইরি রে।

ফের মাইরি বলছিস?

বাঁটুল জিব কাটল।

আমি ভাবছি একটা লোক আমার ভাবী শ্বশুরবাড়িতে এসে খানা গেড়েছে, বাঁটুলদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, লিচুদের হারমোনিয়াম কিনেছে, আর আমি লোকটার কোনও খবরই রাখতুম না!

সকালে আজ অনেক বেশি কাপ চা আঁকতে হল। চোরের খবর নিতে পাড়ার লোকজন এল। দারোগা কাকা নিজে তদন্তে এলেন। ভারী হাসিখুশি ভুড়িওলা প্রকাণ্ড মানুষ। চুরির বিবরণ শুনে বাঙাল টানে বললেন, চোরের ইজ্জত নাই, নিতে নিল ভৈরবদার পাজামাখান? ইস্। কপাল ভাল যে ভৈরবদারে দিগম্বর কইরা পরনের লুঙ্গিখানা লইয়া যায় নাই।

বলতে বলতে নিজেই হেসে অস্থির। চোখে জল পর্যন্ত চলে এল হাসতে হাসতে।

ভৈরবকা রেগে গিয়ে বলেন, তোমাদের অ্যাডমিনস্ট্রেশন দিনে দিনে যা হচ্ছে তাতে পরনের লুঙ্গিও টেনে নেবে একদিন ঠিকই। তার আর বেশি দেরিও নেই। ঘরের বউ, বেটাবেটিকেও টেনে নিয়ে যাবে।

দারোগাকাকা রাগবার মানুষ নন। তার দুই প্রিয় জিনিস হল শ্যামাসংগীত আর জাপান। একটা শুনলে আর অন্যটা খেলে তার দুই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। চায়ের পর জাপান খেয়ে এখনও তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু করছিল। বলেন, অ্যাডমিনস্ট্রেশন তো আমরা চালাই না, চালায় গবর্নমেন্ট। যদি গবর্নমেন্টটাকে চালায় তয় কইতে হয় ভূতে।

ভৈরবকাকা চেঁচিয়ে বলেন, আলবত ভূতে। তোমাদের গোটা অ্যাডমিনস্ট্রেশনটাই আগাগোড়া ভূতের নৃত্য। চুরি বাটপারি, রেপ রাহাজানি এভরিথিং তোমাদের নলেজে হচ্ছে। প্রত্যেকটা সমাজবিরোধীর কাছ থেকে তোমরা রেগুলার ঘুষ খাও।

দারোগাকাকা অবাক হওয়ার ভান করে বলেন, ঘুষ খামু না ক্যান? ঘুষের মধ্যে কোন পোক পড়ছে?

ভৈরবকাকা উত্তেজিতভাবে বলেন, না ঘুষে পোকা পড়বে কেন? পোকা পড়েছে আমাদের কপালে।

দারোগাকাকা আবার ভুড়ি দুলিয়ে হেসে বলেন, আপনের গেছে তো একখান ছিড়া পায়জামা, হেইটার লিগ্যাই এই চিল্লা-চিল্লি? তা হইলে সোনাদানা গেলে কী করতেন?

ছেঁড়া পায়জামাই বা যাবে কেন? ইফ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ গুড দেন হোয়াই ছেঁড়া পায়জামা

ভৈরবকাকা ইংরিজিতে আর থই না পেয়ে থেমে যান। আমরা হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়ি।

ভৈরবকাকা উত্তেজনা সামলে নিয়ে আবার বলেন, ছেঁড়া পায়জামাটা কোনও ফ্যাকটর নয়, ফ্যাকটর হল চুরিটা। আমার প্রশ্ন, চুরি হবে কেন?

দারোগাকাকা বলেন, কুত্তা পোষেন।

কুকুরই বা পুষতে হবে কেন?

তা হইলে চুরিও হইব।

আর তোমাদের যে পুষেছি। এত দারোগা পুলিশ যে সরকার রেখেছে আমাদের ট্র্যাক থেকে নিয়ে?

কই আর পুষলেন। ভাবছিলাম চাকরি ছাইড়া দিয়া আপনের পুষ্যিপুত্তুর হমু। কিন্তু আপনে তো কথাটা কানেই লন না।

কথায় কথায় পলিটিকস এসে গেল এবং তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। আরও দু' রাউন্ড চা করতে হল। পরে দারোগাকাকা উঠতে উঠতে বললেন, চোরটারে ধরতে পারলে এমন শিক্ষা দিমু যে আর কওনের না। হারামজাদায় জানে না, ভৈরবদার ছিড়া পাজামা আমাগো ন্যাশনাল প্রপার্টি।

এ সব গোলমাল মিটলে বাড়িটা একটু ঠান্ডা হল। ভৈরবকাকার বদলে আজ দাদা বাজার করে এনেছে। ফলে রান্নাঘরে আমরা সবাই ব্যস্ত। এক প্রস্থ জলখাবার হবে, সেই সঙ্গে বাবার আর দাদার অফিসের ভাতও।

জলখাবারের চচ্চড়ির আলু ধুতে গিয়ে কুয়োর পাড়ে দেখি, চিনি বাড়ির মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে পড়তে উঠে এসে পুতুল স্নান করাচ্ছে।

বললাম, অ্যাই, মাস্টারমশাই বসে আছেন না?

ছোড়দার অঙ্ক দেখছেন তো!

তা বলে তুই এই সাতসকালে পুতুল খেলবি? যা।

সে গুটি-গুটি চলে যায়। ওর সোয়েটারটা গেছে আমার দোষেই। সামনের শীতের জন্য প্যাটার্ন তুলতে ওটা নিয়েছিল লিচু। কালই ফেরত দিয়ে গেছে। আলিস্যির জন্য আমি ওটা তুলে না রেখে ঠাকুমার ঘরে আলনায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম।

কালও কই হারমোনিয়ামটা নিয়ে একটা কথাও তো বলেনি লিচু। আচ্ছা সেয়ানা মেয়ে যা হোক। ওদের বাড়িতে কখনও গান তুলতে গেলে ওই হারমোনিয়াম দেখলেই আমার হাসি পায়। মাগনা দিলেও নেওয়ার নয়। পাগলা দাশুকে খুব জক দিয়েছে ওরা।

গোমড়ামুখো দাদা কুয়োর পাড়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছে। বাথরুমে যাবে। দেশলাইটা কুয়োর কার্নিশে রেখে বলল, ঘরে নিয়ে যাস তো। নইলে কাক ঠোঁটে করে তুলে পালায়।

পাগলা দাশুকে চিনিস দাদা?

কোন পাগলা দাশু?

মল্লিকদের বাড়িতে যে এসেছে।

ও, অসিতের ভাই। পাগলা নয় তো। পাগলা হতে যাবে কেন?

কথাটা তুলেই আমার লজ্জা করছিল। ব্যাপারটা এত অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ওই হারমোনিয়াম কেনার কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে! লিচুরা আচ্ছা ছোটলোক তো! কী বলতে ওই অখাদ্য হারমোনিয়ামটার জন্য দুশো টাকা নিল?

বাইরের ঘরে একটা বাজখাই গলা শুনে কুয়োতলা থেকেও বুঝতে পারলাম, মল্লিকবুড়ো অর্থাৎ আমার হবু শ্বশুর এসেছেন। চোর আসার খবর পেয়েই আসছে সবাই।

চচ্চড়ির আলু ধুয়ে রান্নাঘরে যেতেই মা বলল, বীরেনবাবুর চা-টা তুই-ই কর।

বীরেনবাবু অর্থাৎ মল্লিকবুড়োর চায়ে বায়নাক্কা আছে। দুধ বা চিনি চলবে না, লিকারে শুধু পাতিনেবুর রস মেশাতে হবে তাও টক চা হলে চলবে না। লিকারে শুধু একটু গন্ধ হবে।

আমি বাগানে পাতিলেবু আনতে যাওয়ার সময় বৈঠকখানার দরজায় পরদার আড়ালে পঁড়িয়ে শুনতে পেলাম মল্লিকবুড়ো বলছেন, শেষ রাতে তো শুনলাম আমার বাগানেও চোর ঢুকেছিল। আমার ভাইপো কানু দেখেছে, ছুকরি একটা চোর বেলফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সাড়াশব্দ পেয়ে পালিয়ে যায়।

বাবা বললেন, ও। সে তো ফুলচোর!

আমি রাঙা হয়ে উঠলাম লজ্জায়।

৩. পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

দুনিয়ার কোনও কাজই বড় সহজ নয়। গান শেখা, সাইকেলে চড়া বা পাহাড়ে ওঠা। সহজ সুরের রামপ্রসাদী আমায় দাও মা তবিলদারি গানটা কতবার গলায় খেলানোর চেষ্টা করলাম। কিছুতেই হল না। অথচ সুরটা কানে যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সহজ, অতি সহজ গান। কিন্তু আমার কান শুনলেও গলা সেই সুর মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। যে সুরটা কানে বাজছে কিন্তু গলায় আসছে না তাকে গলায় আনতে গেলে কী করা দরকার তা জানবার জন্য আমি সিভিল হাসপাতালের ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে একদিন হানা দিলাম।

খুবই ভিড় ছিল আউটডোরে। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় অবশেষে তার চেম্বারে ঢুকতে পেরেছি। নমস্কার ডাক্তারবাবু।

নমস্কার। বলুন তো কী হয়েছে?

আমার কানের সঙ্গে গলার কোনও সমঝোতা হচ্ছে না।

তার মানে কী?

অর্থাৎ কানে যে গানটা শুনতে পাচ্ছি, কিছুতেই সেটা গলায় তুলতে পারছি না।

আপনি কি গায়ক?

না, তবে চেষ্টা করছি।

হাঁ করুন।

করলাম হাঁ। মস্ত হাঁ। ডাক্তার গলা দেখলেন, কপালে আটা গোল একটা আয়না থেকে আলো ফেলে নাক এবং কানও তদন্ত করলেন। তারপর মস্ত একটা খাস ছেড়ে বললেন, হুঁ।

ডিফেক্টটা ধরতে পারলেন?

ডান কানে একটা তেকোনা হাড় উঁচু হয়ে আছে। নাকের চ্যানেলে ভাঙা হাড় আর পলিপাস। গলায় ফ্যারিনজাইটিস। সব ক'টারই ট্রিটমেন্ট দরকার। নাক আর কান দুটোই অপারেশন করালে ভাল হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এত কিছুর পর গান গলায় আসবে?

আশা তো করি। বলে ডাক্তার মৃদু হাসলেন। চাপা স্বরে বললেন, এ সব কি হাসপাতালে হয়? বিকেলের দিকে আমার হাকিমপাড়ার বাসায় যে চেম্বার আছে সেখানে চলে আসবেন।

আমি চলে আসি।

.

আমার গলায় যে সুর খেলছে না সেটা আমাকে প্রথম ধরে দেয় পশুপতি। লিচুর মা কিন্তু রোজই ভরসা দিচ্ছেন যে, একটু-একটু করে আমার হচ্ছে। একদিন মা লাগাতে পারছি অন্যদিন রে-ও লাগছে।

পশুপতি আমার ওপর খুবই রেগে ছিল। হারমোনিয়াম কেনার পর দু দিন আমার সঙ্গে দেখা করেনি। তিন দিনের দিন এসে ফালতু কথা ছেড়ে সহজ ভাষায় বলল, আপনার মতো আহাম্মক দেখিনি। ওই গদা মালের জন্য কেউ দুশো টাকা দেয়? টাকা কি ফ্যালনা নাকি?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, পশুপতি, কোন জিনিসের আসলে কী দাম তা তুমিও জানোনা আমিও জানি না। ঠকেছি না জিতেছি সে বিচারও বড় সহজ নয়।

আর আমি যে একশো টাকার খদ্দের ঠিক করে রেখেছি তার কী হবে? সে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। আমি তো আপনাকে পইপই করে বলে রেখেছিলাম পঁচাত্তর টাকার ওপরে উঠবেন না। আপনি মাল না চিনলেও আমি তো চিনি।

এ কথার কোনও জবাব হয় না। পশুপতিকে কী করে বোঝানো যাবে যে, লিচুদের বাড়িতে সেদিন এক মোহময় বিকেল এসেছিল। ছিল কনে দেখা আলো, ফুলের গন্ধ, হারমোনিয়ামের একাকিত্ব। মন বলছিল, কনে কই? কনে কই? সেই সময়ে কেউ টাকার কথা বলতে পারে? আমি তবু দুশো টাকা বলেছিলাম। এবং বলেই মনে হয়েছিল খুব কম বলা হয়ে গেল। লিচু, লিচুর মা বাবা বোন অবশ্য খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। হতভম্ব হয়ে গেল পশুপতিও। কিন্তু ওই দামের নীচে সেদিন যে হারমোনিয়ামটা কেনা ঠিক হত না তা কেউ বুঝবে না।

পশুপতি হঠাৎ খুব গরম হয়ে বলল, ওটা তো আপনার কোনও কাজেই আসত না। আমাকে একশো টাকায় দিয়ে দিন।

আমি বললাম, আমি একটু-আধটু গানের চর্চা করছি পশুপতি। এটা দেওয়া যাবে না।

পশুপতি ধৈর্য হারাল না। সে দিন চলে গেল বটে কিন্তু ফের একদিন এল। আমার গলা সাধা শুনল। বলল, এ জন্মে আপনার গান হবে না কানুবাবু। আপনার গলায় সুরের স-ও নেই।

অথচ সপ্তাহে দু দিন সন্ধেবেলা আমি রিকশায় হারমোনিয়াম চাপিয়ে লিচুদের বাড়ি গিয়ে হাজির হই। লিচুর মা শত কাজ থাকলেও সব ফেলে রেখে আমাকে গান শেখাতে বসেন, কাছে লিচুও বসে থাকে। আমার সা রে গা মা শুনে কেউ হাসে না, এবং উৎসাহ দেয়। গান শিখবার জন্য আমি লিচুর মাকে মাসে-মাসে পঁচিশ টাকা করে দেব বলেছি।

সকালের দিকে বাঘাযতীন পার্কে আমি সাইকেলে চড়া প্র্যাকটিস করি। দুটো সরু চাকার ওপর সাইকেলে কী ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কী ভাবেই বা চলে তা নিয়ে আমার মনে বহুকাল ধরে প্রশ্ন রয়ে গেছে। আমি আগাগোড়া মধ্য কলকাতায় মানুষ। সেখানে সাইকেল আরোহীর সংখ্যা বেশি নয়, তা ছাড়া অঢেল ট্রাম বাস থাকায় সাইকেল চড়ারও দরকার পড়েনি। এই উত্তরবাংলার শহরে এসে দেখি, প্রচুর সাইকেলবাজ লোক চারদিকে। কাকার বাড়িতে তিন-তিনটে সাইকেল। একটা কাকা চালান, আর দুটো সাইকেল পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। কাকা বললেন, আমোক রোজ অফিস যেতে আসতে রিকশা-ভাড়া দিস কেন? সাইকেলে যাবি আসবি। দুটো পয়সা বাঁচাতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

সেই থেকে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিন্তু সাইকেল কিছুতেই আমাকে সমেত খাড়া থাকতে চায় না। আসলে সাইকেলটা পড়ে যাবে আশংকা করে আমি নিজেও ডান বা বাঁদিকে একটু কেতরে থাকি। ফলে সাইকেল আরও তাড়াতাড়ি পড়ে যায়।

পশুপতি এই সব লক্ষ করে একদিন বলল, সাইকেল হল গরিবদের গাড়ি। আসল বাবুরা চলাফেরা করে রিকশা বা মোটরে। বীরেনবাবুকে কত বার বলেছি, আপনাদের তিন-তিনটে সাইকেল তার গোটা দুই আমাকে বেচে দিন। কিছুতেই রাজি হয় না। একবার বলে দেখবেন নাকি আপনার কাকাকে? ভাল দর দেব।

পশুপতি এ সব কথা ছাড়া দ্বিতীয় কথা জানে না। হয় কেনার কথা বলে, নয়তো বেচার কথা। হারমোনিয়ামটার আশা সে এখনও ছাড়েনি। আমি গানের আশা ছাড়লেই সে হারমোনিয়ামটা অর্ধেক দরে কিনতে পারবে বলে আশা করে আছে। সাইকেলের আশাও তার আছে।

কিন্তু আমি সাইকেল বা গান কোনওটার আশাই ছাড়িনি, আমার জীবনের মূলমন্ত্রই হল, চেষ্টা।

একদিন বিকেলে হঠাৎ লিচু এল।

তার চেহারাটা বেশ লাবণ্যে ভরা। একটু চাপা রং, চোখ দুটো বড় বড়, মুখখানা একটু লম্বাটে, থুতনির খাজটি বেশ গভীর। খুব লম্বা নয় লিচু, তবে হালকা গড়ন বলে বেঁটেও মনে হয় না। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব আছে শরীরে।

বলল, আপনি কি সত্যিই গান শিখবেন? নাকি ইয়ার্কি করছেন?

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে?

লিচু আমার নির্জন ঘরে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই চৌকির বিছানায় বসে বলল, আমরা খুব লজ্জায় পড়ে গেছি।

কেন, কী হয়েছে?

শুনছি, আমরা নাকি আপনাকে বোকা পেয়ে ঠকিয়ে হারমোনিয়ামটা বেশি দামে বেচেছি।

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা কেন? দাম তো তোমরা বলোনি। আমি বলেছি।

সে কথা লোকে বিশ্বাস করলে তো? আপনি হারমোনিয়ামটা আমাদের ফেরত দিন, আপনার টাকা আমরা দিয়ে দেব।

কথাগুলো আমার একদম ভাল লাগছিল না। কলকাতায় হলে কে কার হারমোনিয়াম কত টাকায় কিনল এ নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা থাকত না। কিন্তু মফসসল শহরগুলোয় ব্যক্তিস্বাধীনতা খুবই কম।

আমি লিচুকে বললাম, ফেরত দেওয়ার জন্য তো কিনিনি। আমি সিরিয়াসলি গান শেখার চেষ্টা করছি।

গান আপনার হবে না।

কে বলল?

আমি গলা চিনি, তা ছাড়া গান শেখার আগ্রহ আপনার নেই।

কে বলল?

আমিই বলছি। আমার মনে হয় আপনি ইচ্ছে করেই হারমোনিয়ামটা বেশি দামে কিনেছেন।

লোকে কি ইচ্ছে করে ঠকতে চায়?

আপনি হয়তো আমাদের গরিব দেখে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। কথাটা কেউ বুঝবে না, কেন আমি হারমোনিয়ামটার দুশো টাকা দাম বলেছিলাম। আমার তো মনে হয়, দুশো টাকাও বেশ কমই বলা হয়েছিল। কোন জিনিসের কত দাম তা আজও ঠিক-ঠিক কেউ বলতে পারে না।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, তা নয়। তোমরা তো তত গরিব নও।

আমরা খুবই গরিব। উদাস স্বরে লিচু বলে, এতটাই গরিব যে, আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না।

আমি যদি সকলের কাছে স্বীকার করি যে হারমোনিয়ামটার দর আমিই দিয়েছিলাম।

তাতেও লাভ নেই এখন। লোকে অন্যরকম সন্দেহ করবে। ভাববে, পুরনো জিনিস বেশি দামে কেনার পিছনে আপনার অন্য মতলব আছে।

কথাটা মিথ্যে নয়। আমার অন্য কোনও মতলবই হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা খারাপ কিছু নয়।

লিচু অবাক হয়ে বলে, কী মতলব?

আমি মৃদু হেসে বললাম, সেদিন আমার মনে হয়েছিল, এই হারমোনিয়ামটা হাতছাড়া করতে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার বোন কাঁদছিল, তুমিও বাড়ি থেকে বোধ হয় রাগ করেই চলে গিয়ে অন্য বাড়িতে বসে ছিলে। এই হারমোনিয়ামটার ওপর তোমাদের মায়া মমতা দেখে আমার মনে হল, শুধু জিনিসটার দাম যাই হোক, এটার ওপর তোমাদের টান ভালবাসারও তো একটা আলাদা দাম আছে। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটার কথা ভেবে দ্যাখো। যে কসাইটা মহেশকে কিনতে এসেছিল তার কাছে শুধু চামড়াটুকুর যা দাম, কিন্তু গফুরের কাছে তো তা নয়। শোনো লিচু, আমি কসাই নই। আমি ভালবাসার দাম বুঝি।

শুনে লিচু কেমন কেঁপে উঠল একটু। চোখে জল ভরে এল বুঝি। মাথা নিচু করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর মুখ তুলে ধরা গলায় বলল, আমাদের বাড়িতে তেমন কোনও আনন্দের ব্যাপার হয় না, জানেন। বাবার একটা সাইকেল সারাইয়ের দোকান আছে, তেমন চলে না। অভাবের সংসারে সুখ আর কী বলুন। তবু ওই হারমোনিয়ামটা ছিল, আমরা ওটাকে আঁকড়ে ধরেই বড় হয়েছি। যখন মন খারাপ হত, খিদে পেত কি রাগ হত তখন হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গান গাইতে বসে যেতাম। আমাদের কাছে ওটা যে কতখানি ছিল কেউ বুঝবে না।

তা হলে বিক্রি করলে কেন?

কী করব? বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ায় আমাদের অনেক ধার হয়ে গিয়েছিল। মা আমাদের অনেক বুঝিয়েছিল, হারমোনিয়ামটা বিক্রি করে এখন ধার কিছু শোধ করা হবে, পরে অবস্থা ফিরলে আমরা একটা স্কেল চেঞ্জার কিনবই। তখনই আমরা দুই বোন বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের একমাত্র আনন্দের জিনিসটাও আর থাকছে না। বাড়িটা একদম ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে এরপর।

তোমরা কত দাম আশা করেছিলে?

একশো টাকার বেশি কিছুতেই নয়। পশুপতিবাবুকে তো আমরা চিনি। উনিই আমাদের বাড়ির বাসন কোসন, গয়না, পুরনো আসবাবপত্র সবই কিনেছেন বা বন্ধক রেখেছেন, এমনকী বাবার সাইকেলের দোকানটা পর্যন্ত ওঁর কাছে বাঁধা আছে। উনি কখনও বেশি দাম দেন না। তবে অভাব অনটন বা দরকারের সময় উনিই যে-কোনও জিনিস বাঁধা রেখে টাকা দেন বা পুরনো জিনিস কিনে নেন। আপনি দুশো টাকা দাম বলায় আমরা সবাই ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। পশুপতিবাবু অত বেশি দাম হাঁকার লোক নন।

আমাকে বোকা ভেবেছিলে বোধ হয়?

লিচু মাথা নেড়ে বলল, অনেকটা তাই। তবে আমার মনে হয়েছিল আপনি একটু পাগলাটে, ভাল মানুষ আর টাকাওয়ালা লোক।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলি, কথাটা ঠিক নয় লিচু। আমার কখনও মনে হয়নি যে, হারমোনিয়ামটা কিনে আমি ঠকে গেছি।

লিচু খুব অদ্ভুত অবাক-চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আপনি সত্যিই ঠকেছেন। খুব ঠকেছেন। আমাদের খুব নিন্দে হচ্ছে। আপনার পায়ে পড়ি, হারমোনিয়ামটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। বাবা আপনার টাকা শোধ করে দেবে।

আমি তা জানি লিচু। তবু আমাকে কয়েকদিন ভেবে দেখতে দাও।

লিচু যখন চলে যাওয়ার জন্য উঠল তখন জানালা দিয়ে কিছু রোদ ওর মুখে এসে পড়েছিল কি না ঠিক বলতে পারছি না, তবে মুখখানায় হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখা গিয়েছিল।

রাত হলে রোজই আমি খাওয়ার আগে একটু সামনের বাগানে বেড়াই। আজ পূর্ণিমার ভর ভরন্ত চাঁদ যেন উদ্বৃত্ত জ্যোৎস্নায় ফেটে পড়েছে। গবগ করে নেমে আসছে জ্যোৎস্না। মাঠ ঘাট রাস্তা ভাসিয়ে ড্রেন বেয়ে যাচ্ছে। ছাদ থেকে রেনপাইপ বেয়ে নেমে আসছে।

তেমন গরম নেই। বেলফুল ফুটেছে, তার মাতাল গন্ধে বাতাস মন্থর এবং ভারী। এত গন্ধে মাথা ধরে যায়। শ্বাসকষ্ট হয়। বুক কেমন করে। কলকাতায় আমি কখনও এতটা জায়গা পাইনি। এমন বিনা পয়সায় ফুলের গন্ধের হরির লুট ঘটে না সেখানে। চাঁদের আলো যে এত তীব্র হতে পারে তাও কলকাতায় কখনও খেয়াল করিনি। এ সবই আমার কাছে ভয়ংকর বাড়াবাড়ি। এত বেশি আমার পছন্দ নয়। কিছুই।

খোলা রাস্তায় জ্যোৎস্নায় তাড়া খেয়ে একজন মানুষ মাথা বাঁচাতে দ্রুতপায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে কোলকুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কে ও? কর্ণবাবু নাকি?

জগদীশ মাস্টারমশাইকে এই জ্যোৎস্নায় একদম অন্যরকম লাগে। মুখের বুড়োটে খাজগুলোয় চোখের ঘোলাটে মণিতে কাঁচাপাকা দাড়িতে জ্যোৎস্নার ফোঁটা পড়েছে। নবীন যুবকের মতো তাজা কবি হয়ে গেছে মুখখানা। পরনে ধুতি, গায়ে হাফ হাতা শার্ট, হাতে ছাতা।

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছেন?

এই পথেই রোজ টিউশানি সেরে ফিরি। যাতায়াতের সময় রোজই শুনতে পাই আপনি গান করছেন হারমোনিয়াম বাজিয়ে। বেশ লাগে। দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড গান শুনতেও ইচ্ছে করে। তবে সময় হয় না। রোজই ভাবি একদিন সামনে বসে শুনে যাব।

লজ্জা পেয়ে বলি, গান করছি বললে ভুল হবে। শিখছি।

ভেরি গুড, শেখা জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগে। কোয়ালিফিকেশন যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। দুনিয়ায় কোয়ালিফিকেশনের মতো জিনিস হয় না। যত কোয়ালিফিকেশন তত অপরচুনিটি, যত অপরচুনিটি তত ফ্রিডম, যত ফ্রিডম তত মর্যাল কারেজ। কোয়ালিফিকেশন আরও বাড়াতে থাকুন। ছবি আঁকুন আর্টিকেল লিখুন, ল পড়ুন। কোয়ালিফিকেশনের অভাবেই দেখুন না, মোটে পাঁচটা টিউশানি করছি মেরে কেটে। সায়েন্স জানলে ডজনখানেক করতাম।

তা ঠিক। আমি বলি।

জগদীশ মাস্টারমশাই এই জ্যোৎস্নায় কিছু মাতাল হয়েছেন। কোনওদিন এত কথা বলেন না। আজ ফটকের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, অবশ্য এখানে এই এঁদো। জায়গায় কোয়ালিফিকেশন বাড়ানো খুবই কঠিন। আমার এক ছাত্রী শান্তিনিকেতনে নাচ শিখত। এখন তার খুব নামডাক।

জগদীশ মাস্টারমশাই কখনও ছাত্রীকে মাত্রা ছাড়া বললেন না। ছাত্রী শব্দটা নাকি ব্যাকরণ মতে শুদ্ধ নয়। আমি বললাম, তাই নাকি? খুব ভাল।

তার ওপর এম এ পাশ, গান জানে, ইংরিজিতে কথা বলতে পারে। রং কালো হলে কী হয়, শুনছি খুব বড় ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তার বিয়ে। স্রেফ কোয়ালিফিকেশনের জোরে। এই জোরটা যে কত বড় তা অনেকেই বুঝতে চায় না। বললে ভাবে জগদীশ মাস্টার মাথা পাগলা লোক, আগড়ম বাগড়ম বকে।

বলতে কী জগদীশ মাস্টারমশাইয়ের কথাকে আমি মোটেই আগডুম বাগড়ম মনে করছিলাম না, আমার মনে হচ্ছিল, কথাগুলো বেশ ভেবে দেখার মতো।

আমি ছাত্রদের নিচু ক্লাসেই শিখিয়ে দিই, কখনও কাম হিয়ার বলবে না, কাম একটা চলিষ্ণু শব্দ, হিয়ার একটা স্থান শব্দ। এই দুইয়ে মিল খায় না। তাই কাম হিয়ার বলতে নেই, বলতে হয় কাম হিদার। আমার এক ছাত্র নাইনটিন ফিফটিতে এক সাহেব কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছিল কাম হিদার কথাটা বলে।

আমি বেশ মন দিয়ে শুনি এবং অকৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে বলি, তাই নাকি? দুঃখের সঙ্গে জগদীশবাবু বলেন, দিনকাল আর আগের মতো নেই। ছেলেমেয়েরা আজকাল মাস্টারমশাইয়ের কথা গ্রাহ্য করে কই? এখানকার ফার্স্ট বয়ের খাতাতেও দেখবেন নিখুঁত বাঁধা উত্তর। উদ্ভাবনা নেই, মাথা খাটানো নেই, চিন্তাশীলতা নেই, নাইনটিন ফটিনাইনে

কিংবা কাছাকাছি কোনও বছরে ম্যাট্রিক রচনা এসেছিল–কোনও এক মহাপুরুষের জীবনী, মেদিনীপুরের এক ছাত্র সেই রচনায় নিজের বাবার কথা লিখেছিল। লিখেছিল-দীনদরিদ্র পাঠশালার অল্প বেতনের পণ্ডিত আমার বাবা। কোন ভোর থাকতে উঠে উনি পুজোপাঠ সেরে বাড়ির সামনে তেঁতুলের ছায়ায় শতরঞ্চি পেতে বসেন। তার ছাত্ররা আসে, পুত্রবৎ স্নেহের সঙ্গে তাদের বিবিধ বিদ্যা শেখান তিনি। বিদ্যা বিক্রয় পাপ বলে কারও কাছ থেকে কোনও টাকা নেন না। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরেন, কিন্তু আমাদের সর্বদাই তিনি চরিত্রবান হতে বলেন। বড়ই অভাবের সংসার আমাদের, তবু আমার বাবাকে আমি কখনও উদ্বিগ্ন হতে দেখি না। তিনি শান্ত, নিরুদ্বেগ আত্মবিশ্বাসী। ক্লাসে যেতে কখনও এক মিনিটও দেরি হয় না তার। আমাদের বাড়িতে কোনও ঘড়ি নেই, তবু বাবাকে দেখি সর্বদাই সময়নিষ্ঠ। সাহায্যের জন্য কেউ এসে দাঁড়ালে কখনও তাকে বিমুখ করেন না। কোথায় কোন মানুষের কী বিপদ ঘটল তাই খুঁজে খুঁজে বেড়ান। পরোপকার কথাটা তার পছন্দ নয়। তিনি বলেন, পৃথিবীতে পর বলে কেউ নেই। এইরকমভাবে নিজের বাবার কথা লিখে গেছে আগাগোড়া। শেষ করে বলেছে, আমার জীবনে দেখা এত বড় মহাপুরুষ আর নেই। রচনাটা পড়তে পড়তে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ির লোক আর পাড়াপড়শিকে ডেকে ডেকে পড়িয়েছি, চেঁচিয়ে বলেছি, আমার সোনার ছেলে রে। আমার গোপাল রে। পঁচিশের মধ্যে তাকে চব্বিশ দিয়েছিলাম, মনে আছে। সেই সব ছেলেরা কোথায় গেল বলুন তো!

বলে জগদীশ মাস্টারমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। তার দেখাদেখি আমিও। জগদীশবাবুর দুঃখ হতেই পারে। কারণ তার একমাত্র সন্তান পশুপতি তাকে দ্যাখে না। একই বাড়িতে ছেলে আর ছেলের বউয়ের আলাদা সংসার, ভিন্ন হাঁড়ি। ছেলের প্রসঙ্গ উঠলে জগদীশবাবু শ্বাস ছেড়ে শুধু বলেন, কুপুত্র। কুপুত্র। যতদূর মনে হয়, পশুপতিকে কোনও মহাপুরুষের জীবনী লিখতে দিলে সে কোনওকালেই জগদীশবাবুর কথা লিখবে না।

হঠাৎ জগদীশবাবু গলার স্বরটা নিচু করে বললেন, দামড়াটা আপনার কাছে খুব আনাগোনা করে বলে শুনেছি।

আমি ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলি, আসেন টাসেন, মাঝে মাঝে।

জগদীশবাবু ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিসিয়ে বলেন, খুব সাবধান। একদম বিশ্বাস করবেন না। নিজের ছেলে, তাও বলছি।

আমি পশুপতির হয়ে একটু ওকালতি করে বলি, কেন? এমনিতে লোক তো খারাপ নন।

জগদীশবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, লোক খারাপ নয়! বলেন কী? কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে। দামড়াটার জন্য সমাজে আমার মুখ দেখানোর উপায় নেই, সর্বদা তাই সঙ্গে ছাতা রাখি।

আমি আনমনে বললাম, ছাতা অনেক কাজে লাগে।

যথার্থই বলেছেন। ছাতার কাজ হয়, লাঠির কাজ হয়, আমি অনেক সময় বাজারের থলি না থাকলে ছাতায় ভরে আনাজপাতিও আনি, কিন্তু মুখ লুকোবার জন্য যে জগদীশমাস্টারকে একদিন ছাতার আশ্রয় নিতে হবে তা কখনও কল্পনা করিনি। কুপুত্র! কুপুত্র! ওর সংস্পর্শে আমার পর্যন্ত মর্যালিটি নষ্ট হয়ে গেছে, তা জানেন? ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমিই তো ওর হলে গার্ড ছিলাম। আমার চোখের সামনে দামড়াটা বই খুলে টুকছিল। দেখেও দেখলাম না। ধরলে আর-এ হয়ে যাবে। নিজের বিদ্যের জোরে পাশ করার মুরোদ নেই। শত হলেও নিজের ছেলে তো! দুর্বল হয়ে পড়লাম। এমনকী বাংলা পরীক্ষার দিন ব্যাকরণে মধ্যপদলোপীকে মধ্যপদলোভী লিখেছিল বলে সেটা পর্যন্ত কারেক্ট করে দিয়েছিলাম মনে আছে। তারপর থেকে আমি চাকরিতে মাস্টার হলেও জাতে আর মাস্টার নেই।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, ছেলেপুলের জন্য বাপ-মায়েদের অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, চরিত্র পর্যন্ত। জগদীশবাবু বিষাক্ত গলায় বললেন, তবু কি হারামজাদার মন পেয়েছি নাকি? পাঁচটা পয়সা পর্যন্ত হাতে ধরে দেয় না কখনও। নাকের ডগায় বসে রোজ মাছ মাংস আর ভাল ভাল সব পদ বউ ছেলেপুলে নিয়ে খায়, কোনওদিন বাবা-মাকে একটু দিয়ে পর্যন্ত খায় না। সারাটা জীবন মাস্টারির আয়ে সংসার চালিয়েছি, ভালমন্দ তো বড় একটা জোটেনি। এই বয়সে একটু খেতে-টেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু খাব তার জো কী? গতকাল ডালনা খাব বলে এক জোড়া হাঁসের ডিম এনেছিলাম। আমার গিন্নি সে-দুটো সেদ্ধ করে খোলা ছাড়িয়ে রেখেছেন ডালনা রাঁধবেন। এমন সময় বউমা বোধ হয় আবডালে থেকে ছোট নাতনিটাকে লেলিয়ে দিল। সে হটি হটি পায়ে এসে ঠাকুমার সামনেই থাবিয়ে ডিমদুটো খেয়ে চলে গেল। কিছু বলার নেই। নাতনি খেয়েছে। বুড়োবুড়ি রাতে ডাল আর ডাটা চচ্চড়ি দিয়ে ভাত গিলোম শুকনো মুখে। বড় ছেলে তাকিয়ে সবই দেখল, তবু একটা আহা উঁহু পর্যন্ত করল না। রোজই এমন হয়। ভালমন্দ বেঁধে খেতেই পারি না। নাতি নাতনিদের লেলিয়ে দেয়।

জগদীশবাবু খুব সন্তর্পণে ছাতাটা একটু ফাঁক করে দেখালেন, ভিতরে কাগজে মোড়া বড় মাছের দুটো টুকরো রয়েছে। বললেন,কালবোশ খুব তেলালো মাছ। গিন্নিকে বলা আছে মশলা-টশলা করে রাখবে। একটু বেশি রাত হলে নাতি নাতনিরা যখন অঘোরে ঘুমোবে তখন বেঁধে দুজনে খাব।

বলে মৃদু মৃদু হাসলেন জগদীশবাবু। জ্যোৎস্নায় তার চোখে ভারী স্বপ্নের মতো একটা আচ্ছন্নতা দেখা গেল। মাছের কথা বলার পরই দাঁড়ালেন না, বিদায় না জানিয়েই কেমন যেন সম্মোহিতের মতো হেঁটে চলে গেলেন।

রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের একটেরে নির্জন ঘরটায় বসে বসে বাইরের প্রবল জ্যোৎস্নার বাড়াবাড়ি কাণ্ড দেখতে দেখতে আমি অনেকক্ষণ কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলাম।

কখন শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি তা খেয়াল নেই। গভীর রাতে সিচুদের হারমোনিয়ামটা যেন নিজে নিজেই বেজে উঠল। খুব করুণ একটা গৎ ঘুরেফিরে বাজছে। মাঝে-মাঝে ফুটো বেলো দিয়ে হাফির টানের মতো ভুসভুসে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে বটে, তেমন মিঠে আওয়াজও হচ্ছে না। তবু সুরটা যে করুণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ঘুমের মধ্যেই আমি বললাম, কিছু বলছ?

আমি যে গান গেয়েছিলেম।

তাতে কী? সব হারমোনিয়ামই গান গায়। আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান তার বদলে তুমি....

প্রতিদান? তাও দিয়েছি তো! দুশো টাকা। অর্ধেক ধরা দিয়েছি গো, অর্ধেক আছে বাকি..হারমোনিয়াম গাইতে লাগল।

৪. কাটুসোনা

কাটুসোনা

অনেকে মনে করে, অমিতের সঙ্গে আমার বুঝি ভাব-ভালবাসা আছে। তা মোটেই নয়।

এই শহরে কাছাকাছি থাকা হলে অনেকেই অনেকের চেনা হয়। তারপর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। আমাদের দুই পরিবারেও অনেকটা তেমনি। তা বলে অমিতের সঙ্গে আমার তেমন গাঢ় ভাব কোনওকালেই ছিল না। কথা হয়েছে খুবই কম। আমার দাদার বন্ধু বলে কখনও-সখনও অমিতদা বলে ডেকেছি মাত্র। অমিতও আমাকে তেমন করে আলাদাভাবে লক্ষ করত না।

অমিত খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলে, দারুশ ছাত্র, সব বিষয়েই সে ভীষণ সিরিয়াস, কথাবার্তা বেশি না, যেটুকু বলে তা খুব ওজন করে। এখান থেকে সে স্কলারশিপ নিয়ে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করে শিবপুরে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যায়। সেখানেও আবার দারুণ রেজাল্ট করে। তারপর যায় আমেরিকায়। সেখানেও সে আরও পড়েছে, এখন বড় চাকরি করছে টেকসাসে। আমেরিকায় যাওয়ার কথা যখন হচ্ছিল তখনই আমার হবু শাশুড়ি আর শ্বশুর একদিন খুব সাজগোজ করে মিষ্টির বাক্স নিয়ে আমাদের বাড়ি এলেন।

গিন্নি গিয়ে সোজা শোওয়ার ঘরে ঢুকে মাকে বললেন, তোমার কাটুকে আমার অমিতের জন্যে রিজার্ভ করে রাখলাম।

প্রস্তাব নয়, সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবটা খুবই আচমকা, সৃষ্টিছাড়া। কেন না আমি তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি, ঢ্যাঙা রোগাটে চেহারা। সুন্দরী কি না তা সেই খোলস বদলের বয়সে অতটা বোঝও যেত না। এখন যায়।

আমার হবু শ্বশুর বাইরের ঘরে বাবাকে প্রায় হুকুম করে বললেন, ও মেয়েটার আর অন্য জায়গায় সম্বন্ধ দেখবেন না।

বাবা অবশ্য তেড়িয়া মানুষ, নিজের পছন্দ-অপছন্দটা খুব জোরালো। গম্ভীর হয়ে বললেন, কেন?

আমার অমিত কি ছেলে খারাপ?

অমিতের কথায় বাবা ভিজলেন। চরিত্রবান, তুখোড়, গুণী অমিতকে কে না জামাই হিসেবে চায়? বাবা গলাটলা ঝেড়ে বললেন, খুব ভাল। তবে কিনা আমেরিকায় যাচ্ছে শুনছি।

তা তো ঠিকই।

সেখানে গিয়ে যদি মেম বিয়ে করে।

হবু শ্বশুর খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, এখনকার ছেলেমেয়েরা কি আগের দিনের মতো বোকা? এখন আর মেম দেখে তারা নালায় না, বুঝলেন! হাজার-হাজার বাঙালি ছেলে বিদেশে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে ক'টা মেম বিয়ে করছে আজকাল?

বাবা ঠোঁটকাটা লোক। বলেই ফেললেন, আহা, শুধু বিয়েটাই কি আর কথা! ও দেশে গেলে চরিত্রও বড় একটা থাকে না। বড্ড বেশি সেক্স যে ওখানে!

হবু শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখুন ভায়া, তা যদি বলেন তবে গ্যারান্টি দিতে পারি না। অমিত ফুর্তি মারবার ছেলে নয়। যদি বা কারও সঙ্গে ফুর্তি মারে তবে তাকে শেষতক বিয়েও করবে। ছ্যাবলা নয় তো। তাই ওকে অবিশ্বাস করার কিছু নেই। কিন্তু অঘটনের সম্ভাবনা খুব কম পারসেন্ট। আর যদি কাটুকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে যায় তবে চন্দ্র সূর্য ভেঙে পড়লেও করবেই!

বাবা ভেবেচিন্তে বললেন, টোপটা বড় জব্বর। না গিলে করিই বা কী। তা গিললাম।

ভাল করে গিলন, যেন বঁড়শি খসে না যায়।

বাবার জেরা হল উকিলের জেরা। পরের মুহূর্তেই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কাটুকে আপনাদের পছন্দই বা কেন?

মেয়ের বাপের তো এ প্রশ্ন করার কথা নয়। তারা বলবে, মেয়ে আমাদের অপছন্দ করলেন কেন? এ তো উলটো গেরো।

আফটার অল, ব্যাপারটা পরিষ্কার থাকা ভাল।

হবু শ্বশুর একটু বিপাকে পড়ে বললেন, আসলে কী জানে, মেয়েটিকে বোধ হয় আমি ভাল করে দেখিওনি, পছন্দের প্রশ্ন তাই ওঠে না। তবে আমার গিন্নির ভীষণ পছন্দ।

বাবা হেসে উঠে বললেন, এ তো পরের মুখে ঝাল খাওয়া।

হবু শ্বশুর গম্ভীর হয়ে বললেন, কথাটা ঠিকই। তবে খেতে খারাপ লাগে না। তা ছাড়া আমার মত হল, বিয়ের পর তো ঝগড়া করবে শাশুড়ি আর বউতে, তাই শাশুড়িরই বউ পছন্দ করা ভাল।

তবু কাটুকে আপনার নিজের চোখে একবার দেখা উচিত।

আহা, তার কী দরকার? ওসব ফর্মালিটি রাখুন। দেখার দরকার হলে রাস্তায় ঘাটেই দেখে নেওয়া যাবে। তা ছাড়া ভাল করে দেখিনি বলে কি আর একেবারেই দেখিনি! শ্রীময়ী মেয়ে, অমিতের সঙ্গে মানাবে।

বাবা বিনয়ের ধার না ধেরে বললেন, আর একটা প্রশ্ন। ওকে যদি আপনাদের পছন্দই তবে অমিত আমেরিকায় যাওয়ার আগেই বিয়ে দিচ্ছেন না নে?

শ্বশুরমশাই এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, সেটা কি উচিত হত? নিজের ছেলে সম্পর্কে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বলছি, অনেক দূর দেশে যাচ্ছে, সেখানে কী হয় না হয়, ভাল ভাবে

ফিরতে পারে কি না কে বলবে। সেক্ষেত্রে একটা মেয়েকে দুর্ভোগে ফেলা কেন? আরও একটা কথা হল, বিয়ে হয়ে থাকলে দু'জনেরই মন টনটন করবে, উড়ু উড়ু হবে, বিরহ-টিরহ এসে ভার হয়ে বসবে বুকের ওপর। তাতে দু'জনেরই ক্ষতি।

বাবা এই দ্বিতীয় পয়েন্টটা খুব উপভোগ করলেন, হেসে বললেন, সে অবশ্য খুব ঠিক। আমি ওকালতি পরীক্ষার আগে বিয়ে করায় তিন বারে পাশ করেছিলাম।

শ্বশুরমশাই চিমটি কেটে বললেন, নইলে হয়তো ছয় বার লাগত।

এ সব কথা শুনে আমি সেদিন অবাক, কাঁদো কাদো। রেগেও যাচ্ছি। এ মা! আমার বিয়ে! আমি তো মোটে এইটুকু, সেদিন ফ্রক ছেড়েছি, এর মধ্যেই এরা কেন বিয়ের কথা বলছে? মাথা-টাথা কেমন ওলটপালট লাগছিল, বুকের মধ্যে ঢিবঢ়িৎ। মনে হয়েছিল, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই কোথাও।

বাইরের ঘরের পরদার আড়াল থেকে বাবা আর হবু শ্বশুরের কথা শুনে যখন চোখের জল মুছছি তখন চিনি এসে খবর দিল, মা ডাকছে।

গেলাম। শোওয়ার ঘরে বিছানায় দুই গিন্নি বসে। শাশুড়ি একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসালেন। বললেন, পেট ভরে খাবে দু'বেলা। শরীর সারলে তোমার রাজরানির মতো চেহারা হবে।

এইটুকু হয়ে আছে আজ ক' বছর হল। বলতে নেই আমার শরীর সেরেছে। লোকে সুন্দরীই বলে। বাপের বাড়িতে আমার জীবনটা যেমন সুখে কাটছে শ্বশুরবাড়িতেও তেমনি বা হয়তো তার চেয়েও সুখে কাটবে।

তবে দুঃখও কি নেই? এই যেমন বাপি মরে যাওয়ার দুঃখ, পরীক্ষার ফল ভাল না হওয়ার দুঃখ, বিনা কারণে মন খারাপ হওয়ার দুঃখ। তবে তো আর সত্যিকারের দুঃখ নয়! আমি

বেশ বুঝে গেছি, এই বয়সে আমার চেয়ে সুখের জীন ধূ বেশি মেয়ের নেই। সেইজন্যই আমার ওপর হিংসেও লোকের বড় কম নয়।

গরিব হলেও লিচুদের খুব দেমাক। ভাঙে তো মচকায় না। আমার সুখে ওর বুকটা যদি জ্বলত তবে এক রকম সুখ ছিল আমার। কিন্তু তা হওয়ার নয়। আজ পর্যন্ত ও অমিত আর আমার বিয়ে নিয়ে তেমন কিছু বলেনি। অমিতের মতো এত ভাল পাত্র যে হয় না তাও স্বীকার করেনি কোনওদিন।

বলতে নেই, লিচু দারুণ গান গায়। এই শহরে যত ফাংশন হয়, ও তার বাঁধা আর্টিস্ট। শিলিগুড়ি রেডিয়ো স্টেশনে বহুবার ওর গান হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শিগগির কলকাতা থেকেও ডাক আসবে। প্র্যাকটিস করার জন্য ওর স্কেল চেঞ্জারের দরকার ছিল। কিন্তু সেটা হল না। পুরনো হারমোনিয়ামটা পাগলা দাশুকে দুশো টাকায় গছিয়েও লে চোরের দামের কানাকড়িও ওঠেনি।

আমিও ছাড়িনি। সে দিন নিউ মার্কেটে দেখা। একথা সেকথার পর বললাম, তোরা নাকি পুরনো হারমোনিয়ামটা বেচে দিয়েছিস?

শুনে মুখ চুন হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ, বীরেনবাবুর এক ভাইপো এসেছে কলকাতা থেকে, সে জোর করে কিনে নিল।

জোর করে নে? তোদের বেচার ইচ্ছে ছিল না নাকি?

আমার ছিল না। মা তবু বেচে দিল।

কততে বেচলি?

দুশো টাকায়।

বাঃ, বেশ ভাল দাম পেয়েছিস তো!

আমরা দাম-টামের কথা বলিনি, উনিই ওই দাম দিলেন।

লোকটা বেশ সরল আর বোকা বোধ হয়।

কে জানে? তোর হর দেওর, তোরই বেশি জানার কথা।

আমি ও বাড়িতে যাই বুঝি? লোকটাকে চাখেই দেখিনি।

লিচু এবার খুব একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল, দেখে নিস। দেখতে খারাপ নয়।

আমিও খোঁচা দিতে ছাড়িনি, যার ইন্টারেস্ট আছে সেই বুঝুকঙ্গে খারাপ কি ভাল। আমার দরকার নেই,

লিচু বেশ অহংকারের সঙ্গেই বলল, তবে আমি ঠিক করেছি হারমোনিয়ামটা নিয়ে ওঁর টাকাটা ফেরত দেব।

কেন? আরও বেশি দাম পাবি নাকি?

মোটেই না। বরং দামটা উনি বেশি দিয়েছে বলেই ফেরত দেব।

তাতে লাভ কী?

সব ব্যাপারেই লাভ চাইলে চলবে মে? আমি একটু শ্লেষের হাসি হাসলাম। যাদের ঘটিবাটি বিক্রি করে খাওয়া জোটাতে হয় তাদের মুখে দেমাকের কথা মানায় না। বললাম, তাই নাকি? শুনলেও ভাল লাগে।

লিচুর মুখ আবার চুন হল। মৃদুস্বরে বলল, উনি গান গাইতেও জানেন না। হারমোনিয়ামটা শুধু শুধুই কিনেছেন।

আমি তো শুনেছি, তোরা ওঁকে গান শেখাচ্ছিস?

সেটাও ওঁর মরজি। আমরা তো সাধতে যাইনি।

তবু শেখাচ্ছিস তো?

শিখতে চাইলে কী করব?

শেখাবি। উদাস ভাব করে বললাম।

লিচু একটু রেগে গিয়ে বলল, আমরা শেখালে যদি দোষ হয়ে থাকে তবে তুই-ই শেখা না!

এটা আমাকে গায়ে পড়ে অপমান। আমি বাথরুমে একটু-আধটু গুনগুন করি বটে, কিন্তু সত্যিকারের গান জানি না। এই গান না জানা নিয়ে মল্লিকবাড়ির কর্তা গিন্নির একটু দুঃখ আছে। বীরেনবাবু এককালে এ শহরের নামকরা তবলচি ছিলেন। অমিত কিছুকাল কলকাতায় ক্ল্যাসিকাল শিখেছিল, তবে এখন আর গান গাইবার সময় পায় না।

তবে গান না জানায় আমার জীবনে তো কোনও বাধা হয়নি। একটু দুঃখ মাঝে-মাঝে হয় বটে কিন্তু সেটিও সত্যিকারের দুঃখ কিছু নয়। গান না জানাটাকেও আমি আমার অহংকারের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। সকলের তো গান জানার দরকার হয় না।

তাই আমি দেমাক করে বললাম, আমি শেখাতে যাব কেন? গানের মাস্টারি করে তো আমাকে পেট চালাতে হবে না। গান শেখা বা শেখানোর দরকারই হয় না আমার। আমাদের বাড়িতে বাইজিবাড়ির মতো সব সময়ে গান বাজনা হয়ও না।

লিচু কতটা অপমান বোধ করল জানি না। তবে মুখটা আরও একটু কালো হয়ে গেল। থমথমে গলায় বলল, কর্ণবাবুকে আমরা আর গান শেখাব না বলেও দিয়েছি।

পাগলা দাশুর নাম যে কর্ণ তা এই প্রথম জানলাম। কেউ তো বলেনি নামটা আমাকে। তবু সেই অচেনা মানুষটা যেহেতু আমার শ্বশুরবাড়ির দিককার লোক সেই জন্য ওঁর

হারমোনিয়াম কেনা নিয়ে মনে মনে লিচুদের ওপর একটা আক্রোশ তৈরি হয়েছিল আমার। লিচুকে খানিকটা অপমান করতে পেরে জ্বালাটা জুড়োলো।

আমি ভোরবেলায় উঠি বটে কিন্তু ভৈরবকাকার মতো ব্রাহ্মমুহূর্তে নয়। সেদিন মাকে বললাম, এবার থেকে আমি ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠব, আমাকে ডেকে দিয়ে তো।

উঠে কী করবি?

গলা সাধব।

মা একটু অবাক হলেও কিছু বলল না।

বাবাকে গিয়ে বললাম, আমার একটা স্কেল চেঞ্জার চাই।

বাবাও অবাক হয়ে বলল, কী করবি?

গান গাইব।

বাবা শুনে খুশিই হলেন। বাবা মানুষের কর্মব্যস্ততা পছন্দ করেন। কাজ না থাকে তো যা হোক কিছু করো, পরের কাজ টেনে নাও নিজের ঘাড়ে। সময় যেন বৃথা না যায়।

বাবা বললেন, কিন্তু তোকে শেখাবে কে?

কালীবাবুর কাছে শিখব। ওঁকে তুমি রাজি করাও।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্কেল চেঞ্জার এসে গেল। কালীবাবুও রাজি হলেন। উনি অবশ্য অ্যাডভান্সড ছাত্রছাত্রী ছাড়া নেন না, কিন্তু টাকা এবং প্রভাবে কী না হয়!

আমার গলা শুনে কালীবাবু খুব হতাশও হলেন না। বললেন, গলায় প্রচ্ছন্ন সুর আছে। শান দিলে বেরিয়ে আসবে। সকালে আর বিকেলে কম করেও দু'ঘণ্টা করে গলা সেবো।

তা সাধতে লাগলাম। প্রথম দিকে বুকের জ্বালা, আক্রোশ, টেক্কা মারার প্রবল ইচ্ছেয় দু' ঘণ্টার জায়গায় তিন-চার ঘণ্টাও সাধতে লাগলাম।

কিন্তু গলায় প্রচ্ছন্ন সুর থাকলেও আমার ভিতরে গানের প্রতি গভীর ভালবাসা নেই। তাই গলা সাধার পর খুব ক্লান্তি লাগে। স্ব ছেড়েও দিচ্ছি না।

খবর পেয়ে মল্লিকবাড়ির কর্তা একদিন এসে হাজির। বললেন, তবলাডুগি কোথায়? তবলচি ছাড়া কি গান হয়? দাঁড়াও আমিই পাঠিয়ে দেবখন। আমারটা তো পড়েই আছে।

ভাবী বউমা গান শিখছে জেনে ভারী খুশি হয়েছেন, ওঁর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। চিনি ছাড়া চা করে দিলাম। চুমুক দিয়ে বললেন, চমৎকার! সবই চমৎকার। কী চমৎকার তা অবশ্য ভেঙে বললেন না।

সেই দিনই ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে ডুগি তবলা এল। রিকশা থেকে চামড়ার ওপর গদির ঢাকনা দেওয়া পেতলের ডুগি আর তবলা নিয়ে ও বাড়ির চাকর নামল। তবলার সঙ্গে শাড়ির পাড় দিয়ে জড়ানো বিড়ে পর্যন্ত।

দেখে এমন লজ্জা পেলাম!

মল্লিকবাড়ির চাকর সর্বেশ্বর বলল, বাবু তো শিকদার তবলচিকে দিদিমণির জন্য ঠিক করেছেন। কালী গায়েনের সঙ্গে তিনিও আসনে।

শুনে আমার হাত পা হিম হওয়ার জোগাড়। একেই কালীবাবুর কাছে গান শেখাটাই আমার আস্পদ্দা, তার ওপর শিকদার তবলচি! শিকদার হলেন এ জেলার সবচেয়ে ওস্তাদ লোক। কলকাতার সদারঙ্গ আর কজ সংস্কৃতিতেও বাজিয়েছেন। শোনা যায় কণ্ঠে মহারাজের কাছে শিখেছিলেন। দুই বাঘা ওস্তাদ আমার মতো আনাড়িকে শেখাতে আসবেন শুনে আমার গান সম্পর্কে ভয় বরং আরও বাড়ল।

বাড়ির লোকও আয়োজন দেখে কিন্তু কিন্তু করছে। ব্যাপারটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তা আমিও টের পাচ্ছি। কিন্তু বঁড়শি গিললে আর কি ওগরানো যায়?

আমার রাশভারী দাদা বলল, এ যে একেবারে মাথা ধরিয়ে ছাড়লি রে কাটু!

বাটুল আর চিনিকে পড়াতে আসেন জগদীশ মাস্টারমশাই। এ বাড়ির বাঁধা প্রাইভেট টিউটর। ওঁর কাছে দাদা পড়েছে, আমিও পড়েছি। গান বাজনা শুনে উনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, এই তো চাই। কোয়ালিফিকেশন যত বাড়ানো যায় ততই মানুষের শক্তি বাড়ে। খুব গাও, গেয়ে একেবারে ঝড় তুলে দাও। সঙ্গে নাচও শিখে ফেলল। ছবি আঁকা, হোমিওপ্যাথি, ইলেকট্রিকের কত যা শিখবে তাই জীবনে কাজে লাগবে।

আমি হাসি চাপবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঁটুল আর চিনি এমন বদমাশ যে, হি হি করে ওঁর মুখের সামনেই হেসে ফেলল। সেই দেখে মুখে আঁচল চাপা দিয়েও আমি হাসি সামলাতে পারলাম না।

জগদীশ সরল মানুষ। হাসি দেখে নিজেও হাসলেন। বললেন, ইদানীং একটা গানের হাওঃ এসেছে মনে হচ্ছে। বীরেনবাবুর ভাইপোও গান শিখছে। চারদিকেই গান আর গান। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যেকটা বাড়ি থেকেই গানের শব্দ কানে আসে।

আড়চোখে লক্ষ করি, জগদীশবাবুর জামার পকেট থেকে কাগজে মোড় লটকা মাছের শুঁটকি উঁকি দিচ্ছে। সেইদিকে চেয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শহরের সব বাড়িতে সবাই গান গাইলে আমার আর গান শেখার মানে হয় না।

একদিন সকালে উঠে গলা সাধতে বসে হারমোনিয়ামটার দিকে ক্লান্তভাবে চেয়ে রইলাম। একদম ইচ্ছে করছে না গলা সাধতে।

ভৈরবকাকা প্রাতঃভ্রমণে বেরোচ্ছিলেন। আমি বললাম, আমিও যাব।

গলা সাধবি না?

একদিন না সাধলে কিছু হবে না। ফিরে এসে সাধনখন।

চল তা হলে।

এক-একটা সময় আসে যখন ঘাড়ে ভূত চাগে। মখটা পাগল-পাগল লাগে। সারা শরীরে খুসখুস একটা ভাব। তখন বেহেড এগ কিয় কমতে ইচ্ছে যায়। মনে হয় ঢিল মারি, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আবোল-তাবোল বলি, হাই উনাদের মতো খুব নাচি, হঠাৎ গিয়ে রাস্তার লোকের কান মলে দিই, হোঃ হোঃ করে হাসিবি হউউ করে কাদি।

কোনও মানে হয় না, তবু এ রকম হয়। আজ সকালে আমার এ রকম হচ্ছিল।

ভৈরবকাকাকে এগিয়ে যেতে দিয়ে আমি সত্যিই রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে এ বাড়ি সে বাড়ির ছাদে ছুঁড়ে মারতে লাগলাম। টিনের চাল না হলে হয় না। কী করব, ধারে কাছে টিনের চালই নেই। তখন কাকভোরের মায়াবী অন্ধকারে আমি পে খুলে চুল এলো করে দিই, কোমরে শক্ত করে আঁচল জড়াই, তারপর চৌপথিতে দাঁড়িয়ে ফিনফিরে খানিকটা বেতালা নেচে নিই।

শুলশুল ভাবটা তবু যায় না।

মনের মধ্যে লুকোনো দুষ্টুমি ছিলই। নইলে খামে আবার মল্লিকবাড়ির ফটক খুলে বাগানে ঢুকব কেন? ধরা পড়লে লজ্জার একশেষ। বাড়ির ভাবী বউয়ের কোমরে আঁচলবাঁধা এলোকেশী মূর্তি দেখলে কর্তা গিন্নি মুছা যানে।

তবু কেন যে মনের মধ্যে এমন পাগল-পাগল! আমি গাছ মুড়িয়ে ফুল ছিঁড়তে থাকি। কোঁচড় ভরে ওঠে। তবু ছাড়ি না। ওদিকে আকাশ ফরু হয়ে যাচ্ছে। লোকজন জেগে উঠছে। ফুল ছেড়ে আমি কয়েকটা গাছের নরম ডাল শব্দ করে ভেঙে দিলাম।

ধরা পড়ব? পড়েই দেখি না!

৫. পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

মেয়েটা যে চোর নয় তা আমি জানি। এর আগেও ওকে একদিন ফুল চুরি করতে দেখেছি। তবে ফুল চুরি সত্যিকারের চুরির মধ্যে পড়ে না বলে আমি ওকে ধরিনি।

লিচুদের হারমোনিয়াম ফেরত দিয়েছি। লিচুর বাবা আমাকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলেছেন বাকিটা পরে দেবেন।

পশুপতি সব খবরই রাখে। হারমোনিয়াম ফেরত দেওয়ার পরের দিন এসে এক গাল হেসে বলল, ও টাকা আর পেয়েছেন।

আমি বললাম, ওরা লোক খারাপ নয়।

আপনি ওদের কতটুকু চেনেন? আমি বহুকাল ধরে ওদের জানি।

কী জানেন?

জানি যে হারমোনিয়ামের টাকা আপনি ফেরত পাবেন। ওই যে পঁচিশটা টাকা ঠেকিয়েছে ওই ঢের। বরং আমাকে অর্ধেক দামে দিলেও আর তাকে টাকা উসুল হত।

আমি একটু সন্দিহান হই। কেন যেন মনেহটেকটি আমি সত্যিই পাবনা। তবুদৃঢ়স্বরে বলি, ওদের আত্মমর্যাদার বোধ বেশ টনটনে।

আপনি সবাইকেই ভাল দ্যাখেন। অভ্যেসটা খারাপ নয়। কিন্তু এটা ভালমানুষীর যুগ নয় কিনা। বলেই পশুপতি আচমকা জিজ্ঞেস করে, লিচুকে আপনার কেমন লাগে?

আমি একটু থতমত খেয়ে বলি, হঠাৎ একথা কেন?

কারণ আছে বলেই জানতে চাইছি। পশুপতি মিটিমিটি হাসে।

আমি পশুপতির মতলবটা বুঝতে না পেরে অস্বস্তি বোধ করে বলি, খারাপ কী? ভালই তো।

কচু বুঝেছেন।

তার মানে?

পশুপতি একটা খাস ফেলে বলে, বেশি ভেঙে বলতে চাই না তবে এবার থেকে লিচু বোধহয় আপনার কাছে একটু ঘন ঘন যাতায়াত করবে।

কেন?

যুবতী মেয়েদের দিয়ে অনেক কাজ উদ্ধার হয় কিনা। আপনি পাত্র হিসেবেও ভাল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, খোলসা করে বলুন তো! কাজ উদ্ধারের কথাটা কী?

দূর মশাই! এ তো আজকাল বাচ্চারাও বোঝে।

আমি বাচ্চাদেরও অধম।

পশুপতি কথাটা স্বীকার করে মাথা নাড়ল, সেটা মিথ্যে বলেননি। নইলে কেউ ভাঙা হারমোনিয়ামের জন্য দুশো টাকা দেয়। সে তো না হয় টাকার ওপর দিয়ে গেছে, কিন্তু এখন যে আপনার জীবন নিয়ে টানাটানি।

তার মানে?–আমি অবাক হই, একটু চমকেও যাই।

লিচুকে আপনার সঙ্গে ভজানোর তাল করেছে। লিচুর বাবা একটু গবেট বটে, কিন্তু মা অতি ঘড়েল। মতলবটা তারই।

বাজে কথা। ওরা ওরকম নয়।

পশুপতি মিটিমিটি হাসে। বলে, লিচুর মা তোক চেনে, যে মানুষ ভাঙা হারমোনিয়াম দুশো টাকায় কিনতে পারে সে কালো কুচ্ছিত মেয়েকেও বিনা পণে ঘরে তুলতে পারে। দুনিয়ায় কিছু বোকা লোক না থাকলে চালাকদের পেট চলত কী ভাবে?

আমি কথা খুঁজে না পেয়ে বলি, লিচু মোটেই কালো কুচ্ছিত নয়।

ও বাবা! তাহলে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। পশুপতি খুব আহ্লাদের হাসি হেসে বলে, বলে কী! লিচু কালো কুচ্ছিত নয়? লিচুর মা সত্যিই লোক চেনে দেখছি!

আমি শ্লেষের হাসি হেসে বলি, আমি অত বোকা লোক নই।

না হলেই ভাল। সুপাত্ররা হচ্ছে উঁচু গাছের ফল। পাড়তে আঁকশি লাগে। মেহনত লাগে। শুধু লক্ষ রাখবেন যেন নজরটা ছোট করতে না হয়।

আপনার সন্দেহটা অমূলক। লিচু আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেনি।

পশুপতি বলল, এবার করবে, যাতে আপনি টাকার তাগাদাটা না করতে পারেন। আপনি মল্লিকবাবুর ভাইপো, তায় ভাল চাকরি করেন। লিচু যদি আপনাকে ভজাতে পারে তো হারমোনিয়ামের ফেরত-টাকাটাও ঘরে রইল। ভাল জামাইও জুটল।

যাঃ!

পশুপতি নিচু স্বরে বলল, আমি ওদের হারমোনিয়ামটার জন্য গতকালই পঁচাত্তর টাকা অফার দিয়ে এসেছি। কিন্তু ওদের নজর আপনি উঁচু করে দিয়ে এসেছেন। পঁচাত্তর শুনে বাড়িশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। লিচুর মা এখন পৌনে দুশো হাঁকছে। যাক সে কথা। কাল

ওই দরাদরির ফাঁকেই লিচুর মা বলে ফেলল, কর্ণবাবুর সঙ্গে লিচুকে বেশ মানায়। মনে হয় কর্ণবাবুরও লিচুকে পছন্দ।

আমি কথাটার মধ্যে খারাপ কিছু খুঁজে না পেয়ে বলি, তাতে কী হল?

এখনও কিছু হয়নি বটে, তবে সাবধান করে দিলাম। উঁচু গাছের ফল উঁচুতেই ঝুলে থাকবার চেষ্টা করবেন। টুক করে যার তার কোচড়ে খসে পড়লে না। আর একটা কথা।

কী?

টাকাটা যদিও ওরা দেবে না, তবু আপনি তাগাদা দিতেও ছাড়বেন না। আমার এক চেনা লোককে একবার পঁচিশটা টাকা ধার দিয়েছিলাম। মহা ধুরন্ধর লোক, ছ' মাস ঘুরিয়ে কুড়িটা টাকা শোধ দিল, পাঁচটা টাকা আর দেয় না। ভেবেছিল কুড়ি টাকা পেয়ে ওই পাঁচটা টাকা বোধহয় আমি ছেড়ে দেব। আমি কিন্তু ছাড়িনি। প্রতি সপ্তাহে গিয়ে তার দোকানে দেখা করেছি, চা খেয়েছি, গল্প করেছি, উঠে আসবার সময় বলেছি, আমার সেই পাঁচটা টাকা কবে দেবেন? মনে মনে জানতাম, দেওয়ার মতলব নেই, তবু তাগাদা দেওয়াটা ধর্ম হিসেবে নিয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর পরে লোকটা তিতিবিরক্ত হয়ে শেষ পাঁচটা টাকা একদিন ঝপ করে দিয়ে ফেলল। তাই বলছি, লোককে তাগাদা দিতে ছাড়বেন না। দেনাদারকে তার দেনার কথা ভুলে যাওয়ার সুযোগ দিতে নেই। সবসময়ে তাগাদায় রাখলে সে তার অন্যমনস্কতা বা কুমতলব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলি, সে আমি পারব না।

পশুপতি খুব আন্তরিকভাবে বলে, কথাটা অন্যদিক দিয়ে ভেবে দেখুন। যদি আপনার টাকাটা ওরা মেরেই দেয় তবে সেটা তো ওদের পাপই হল? জেনেশুনে একটা লোককে পাপের ভাগী হতে দেওয়াটা কি ভাল? শক্ত কাজ কিছু তো নয়!

অগাদা দিতে আমার লজ্জা করবে। থাকগে টাকা।

পশুপতি স্নেহের সঙ্গে বলে, আপনি ভীষণ ছেলেমানুষ। একটু শক্ত-পোক্ত না হলে, চক্ষুলজ্জা-টজ্জা বাদ না দিলে এই মতলববাজদের দুনিয়ার টিকে থাকবেন কী করে? কী করতে হবে তা শিখিয়ে দিচ্ছি। বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে হিলকার্ট রোডে লিচুর বাবার সাইকেলের দোকানে বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হবেন। বৃষ্টি বাদলার কথা বলবেন, বাজার দরের কথা বলবেন, চলে আসবার সময় খুব আলতো করে বলে আসবেন, সেই হারমোনিয়ামের টাকাটার কথা মনে আছে তো? ব্যস, ওতেই হবে। শুধু মনে করিয়ে দেবেন মাঝে মাঝে।

আমি চুপ করে আছি দেখে পশুপতি মিটিমিটি হেসে বলল, দাসীর কথা বাসি হলে কাজে লাগে। একটা পরামর্শ দিয়ে রাখি। লিচু যদি বেশি মাখামাখি করতে আসে, আর আপনিও যদি ভজে যান, আর তারপর যদি কখনও ওর হাত থেকে বাঁচবার জন্য আঁকুপাঁকু করেন তাহলে মাঝে মাঝে লিচুকেও টাকার কথাটা বলবেন। প্রেম কাটানোর এমন ওষুধ আর নেই। টাকার তাগাদা হল হাতুড়ির ঘা, আর প্রেম হল ঠনঠুন পেয়ালা।

ব্যাপারটা এই পর্যন্ত হয়ে থেমে আছে। পশুপতির কথায় আমি গুরুত্ব দিইনি বটে কিন্তু ভারী একটা অস্বস্তি হচ্ছে সেই থেকে। গতকাল সকালেই লিচুর বাবা এসে ওঁদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পূজোর নেমন্তন্ন করে গিয়েছিল। আমি যাইনি অস্বস্তিতে। নিজের ওপর আমার কোনও বিশ্বাস নেই। এই সেদিনও হারমোনিয়ামটা কিনতে গিয়ে আমার মন কনে কই, কনে কই' বলে নাচানাচি জুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমার কমে তো ঠিক হয়েই আছে, কতকাল ধরে। কলকাতার হিদারাম বাঁড়ুজ্জে লেনের সায়ন্তনীই আমার সেই ভাবী কনে। তবু যে আমার মন মাঝে মাঝে দুর্বল হয় তার কারণ বোধ হয়, সায়ন্তনী আর আমার মাঝখানে কয়েকশো মাইলের মাঠ-ঘাট, জল-জঙ্গল, নদী-নালার দূরত্ব। তারপর উত্তরের এই হিমালয়-ঘেঁষা জায়গাটার দোষ আছে। প্রথম প্রথম এখানে এসে আমার কলকাতার জন্য মন কেমন করলেও ধীরে ধীরে এ জায়গার বাতাসে একটা গভীর বনজঙ্গলের মাতলা গন্ধ, উত্তরে ভোরের ব্রোঞ্জ রঙা পাহাড়ের ধীরে ধীরে রং পালটানো, উদাস আকাশ আমাকে নানা ব্যঞ্জন দিয়ে ধীরে ধীরে মেখে ফেলেছে। ছুটির দিনে নতুন

নতুন পাহাড় আর জঙ্গল খুঁজতে গিয়ে এমন গভীর নির্জনতার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যে আর ফিরতে ইচ্ছে করে না। তাই ধীরে ধীরে কলকাতার কথা ভুলে যাচ্ছি। কলকাতার কথা মনে না পড়লে কিছুতেই সায়ন্তনীর কথাও মনে পড়ে না। আর যত সায়ন্তনীর কথা মনে না পড়ে তত আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

আজকাল আমি নিয়ম করে রোজ সকাল বিকেল দু'ঘণ্টা করে কলকাতা আর সায়ন্তনীর কথা ভাবতে চেষ্টা করি। ঠিক পরীক্ষার পড়ার মতো করে। কিন্তু খারাপ পড়ুয়া যেমন বারবার ঘ্যান ঘ্যান করে মুখস্থ করেও পড়া ভুলে যায়, আমারও অবিকল সেই অবস্থা।

আজও ভোরবেলা উঠে আমি জানালা দিয়ে ব্রোঞ্জ রঙের পাহাড়ের দিকে চেয়েই বুঝলাম, ওই চুম্বক পাহাড় রোজই একটু একটু করে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার মগজ ধোলাই করছে। কলকাতাকে মনে হয় পিকিং বা আডেলেডের মতো দূরের শহর।

ফলে আজ সকালে আমি উঠে প্রথমে কিছুক্ষণ কলকাতার অলিগলি, আবর্জনা, ডবলডেকার, ট্রাম, মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া আর হাওড়ার ব্রিজের ছবি ধ্যান করলাম। খুবই অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া দেখাল। এরপর কিছুক্ষণ সায়ন্তনীর কথা ভাবতে গিয়ে আতঙ্কে আমার বুক হিম হয়ে গেল। কালও সায়ন্তনীর ছোট কপাল, থুতনি আর কানের বড় বড় লতি ধ্যানে দেখতে পেয়েছিলাম। আজ শুধু কপালটা ধ্যানে এল, বাকিটা একদম মনে পড়ল না। আগামীকাল যদি ধ্যানে সেই কপালটুকুও না আসে!

প্রাণপণে সেই কপালটাকেই যখন স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছি তখনই ফটকে শব্দ। ফুলচোরের আগমন।

এই মেয়েটাকে আমি আগেও একবার ফুল চুরি করতে দেখেছি। কিছু বলিনি। আজও ভাবলাম কিছু বলব না। বাগান থেকে কিছু ফুল চুরি গেলে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমার মনের বাগানের সব ফুলই যে চুরি হয়ে গেল! কলকাতা নেই, সায়ন্তনী নেই! তবু যে কী করে বেঁচে আছি!

জানালাটা ভেজিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে রইলাম চোখ বুজে।

কিন্তু ফুলচোরের সাহস আজ মাত্রা ছাড়িয়েছে। আমার জানালার নীচে দোলনচাপার গাছের নরম ডগাগুলো ভাঙছে মটমট করে, গন্ধরাজের গাছে প্রায় ঝড় তুলল কিছুক্ষণ, তারপর চন্দ্রমল্লিকার ঝোপ মাড়িয়ে বাগানের পশ্চিমধারে কলাবতীর বনে ঢুকল মত্ত হাতির মতো।

এতটা সহ্য করা যায় না। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

বাগানে যখন পা দিয়েছি তখন চারদিক বেশ ফরসা। সবই প্রায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গন্ধরাজ গাছের পাশে ফুলচোরকেও জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এবং আশ্চর্যের কথা, ফুলচোরও আমাকে বড় বড় চোখে দেখছে। ভয় পাচ্ছে না, পালাচ্ছেও না।

চোর যদি চোরের মতো আচরণ না করে তবে যারা চোর ধরতে যায় তাদের বড় মুশকিল।

চোরের সঙ্গে চোখাচোখি হলে কী বলতে হয় তা ভেবে না পেয়ে আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম! যেন দেখিনি। একটু গলা খাকারি দিয়ে বুঝতে দিলাম যে, সে এখন চলে গেলে আমি কিছু বলব না।

কিন্তু ফুলচোর গেল না। বরং পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, ফুলচোর যথেষ্ট কাছে এসে গেছে।

ফুলচোর আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনিই কি পাগলা দাশু?

সত্য বটে, এখানকার চ্যাংড়া ছেলেরা আমার খ্যাপানো নাম রেখেছে পাগলা দাশু।

ফাজিল মেয়েটার দিকে আমি কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি, আপনাকে এর আগেও আমি একদিন এই বাগান থেকে ফুল চুরি করতে দেখেছি। কী ব্যাপার বলুন তো!

ফুলচের যথেষ্ট সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী। গন্ধরাজের বাগানে সে পঁাড়িয়ে। পিছনে ব্রোঞ্জ রঙা পাহাড়, ফিরোজা আকাশ, গাছপালার চালচিত্র নিয়ে খুব ঢিলাঢালা ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেন গোটা দুনিয়াটাই ওর। ডোনট কেয়ার গলায় বলল, ফুল দেখলেই আমার তুলতে ইচ্ছে করে যে! কী করব বলুন।

তা কথাটা মেয়েটার মুখে মানিয়েও গেল। সুন্দরীদের হয়তো সবই মানায়। বলতে নেই, ফুলচোর দেখতে বেশ। পেট-কোচড়ে এক কাড়ি ফুল থাকায় গর্ভিণীর মতো দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু সেই সামান্য অপ্রাসঙ্গিক জিনিসটা উপেক্ষা করলে ফুলচোরের যথেষ্ট ফরসা রং, লম্বাটে প্রখর শরীর, নরুন দিয়ে চাছা তীব্র সুন্দর মুখখানা রীতিমতো আক্রমণ করে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ওর দৃষ্টিতে দুঃখহীন অকারণ আনন্দের উজ্জ্বলতা। হয়তো ফুলচোর রোজ ভাল খায় এবং হজম করে। হয়তো বড় ঘরের মেয়ে। সম্ভবত কোনওদিনই ও রাতে দুঃস্বপ্ন দ্যাখে না। ভাল বরও ঠিক হয়ে গেছে কি? নইলে এমন উজ্জ্বলতা চোখে আসার কোনও কারণ নেই। আমার মন বেহায়া বেশরম রকমে নেচে উঠে বলতে লাগল, এই কি কনে? এই কি কনে?

ফুল তোলা নিয়ে বার্নার্ড শ-এর একটা বেশ জুতসই কথা আছে। এই মওকায় কথাটা লাগাতে পারলে হত। কিন্তু আমার কখনও ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি মনে পড়ে না। এ বারেও পড়ল না। গম্ভীর হলে আমাকে চারলি চ্যাপলিনের মতো দেখায় জেনেও আমি যথাসাধ্য গম্ভীর হয়ে বললাম, ও।

মেয়েটা খুব ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বলল, রাগ করলেন?

বঙ্কিমের বিড়াল প্রবন্ধে একটা কথা আছে নাঃ দুধ আমার বাপেরও নয়, দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে। প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই। সুতরাং রাগ করিতে পারি না। এই ব্যাপারেও তাই। ফুল গাছের, তুলেছে ফুলচোর। এ ফুলে আমার বা কাকার যে অধিকার, ফুলচোরেরও তাই।

বললাম, না, রাগ করার কী?

মনে মনে ভাবলাম, কোনও খেদি-পেঁচি এরকম চোখের সামনে দিনেদুপুরে পুকুরচুরির মতো ফুল চুরি করতে এলে এত সহজে আমি কঠিন থেকে তরল হতে পারতাম না। মনে হচ্ছিল সৌন্দর্যটা চোরদের একটা বাড়তি সুবিধে। ভাবলে, সৌন্দর্যটা সকলের পক্ষেই বেশ সুবিধাজনক। আদতে ওটা একটা ফালতু উপরি জিনিস। কেউ কেউ ওই ফালতু জিনিসটা নিয়েই জন্মায়, আর তারাই দুনিয়ার বেশির ভাগ পুরুষের মনোযোগ কব্জা করে রাখে। যারা সমান অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে বিস্তর মারদাঙ্গা, হামলা, আন্দোলন চালাচ্ছে তারা এ ব্যাপারটা বুঝতে চায় না। একজন সুন্দরীর যে অধিকার, একজন খেদি বা পেঁচি কোনওকালে সে অধিকার অর্জন করতে পারে না, প্রকৃতির নিয়মেই সমান অধিকার বলে কিছু নেই।

ফুলচোর করুণ মুখ করে বলল, তা হলে মাঝে মাঝে এ বাগানে ফুল তুলতে আসব তো! কিছু মনে করবেন না?

আমি বললাম, না, মনে করার কী?

বারবারই আমার মনে কী যেন পড়িপড়ি করেও পড়ছে না। সুন্দর বলে নয়, আমি ফুলচোরকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে বার বার দেখছি অন্য কারণে। মুখটা চেনা। ভীষণ চেনা। এক্ষুনি চিনে ফেলব বলে মনে হচ্ছে, অথচ স্পষ্ট মনে পড়ছে না।

মেয়েটি বলল, পাগলা দাশু বলেছি বলে কিছু মনে করেননি তো! আপনার একটা পোশাকি নামও যেন শুনেছিলাম কার কাছে। লিচু? হ্যাঁ লিচুই বলছিল সেদিন। কী যেন!কানমলা না ওরকমই শুনতে অনেকটা–কী যেন!

আমি ফাজিল মেয়েদের ভালই চিনি। কোনও কোনও মেয়ে এ ব্যাপারটা নিয়েই জন্মায়। ফাজলামিতে তাদের ক্ষমতা এতই উঁচু দরের যে টক্কর দিতে যাওয়াটা বোকামি।

আমি বললাম, অনেকটা ওরকমই শুনতে। কর্ণ মল্লিক।

মেয়েটা আবার করুশ মুখ করল। বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। কী যে ভুল হয় না মানুষের। লিচুকে আপনি চেনেন? আমার বন্ধু। খুব বন্ধু আমার। আপনি লিচুদের হারমোনিয়াম কিনেছিলেন, তাও জানি।

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, হারমোনিয়াম ফেরত দিয়েছি।

তাই নাকি? ও মাঃ, ফুলচোর তার চোখ কপালে তুলে বলল, তা হলে কী হবে! গান শেখা ছেড়ে দিলেন বুঝি?

মাথা নেড়ে বলি, ঠিক তা নয়। তবে অনেকটা এরকমই। আসলে গান বোধ হয় আমার লাইন নয়।

করুণ মুখ করে ফুলচোর বলে, আমারও নয়। তবু শিখতে হচ্ছে, জানেন!

কেন?

বিয়ের জন্য। ফুলচোর খুব হেসে বলল, গান না জানলে বিয়েই হবে না যে!

ফাজলামি বুঝে আমি গম্ভীর হয়ে বলি, কারও কারও বিয়ের জন্য না ভাবলেও চলে।

হাতে ভাল পাত্র আছে বুঝি?

ব্যথিত হয়ে বলি, থাকলেই বা কী? সুন্দরীরা সুপাত্রের হাতে বড় একটা পড়ে না।

ফুলচোর হেসে ফেলে এবং গজদন্ত সমেত তার অসমান দাঁত দেখে আবার মন উথাল পাথাল করতে থাকে। একে আমি কোথায় দেখেছি! ভীষণ চেনা মুখ যে!

ফুলচোর বলল, আমার কিন্তু ভীষণ সুপাত্রের হাতে পড়ার ইচ্ছে। সেইজন্যই কোয়ালিফিকেশন বাড়াচ্ছি। সুপাত্রের খোঁজ পেলে আমার জন্য দেখবেন তো!

সেজোকাকা উঠে পড়েছে, টের পাচ্ছি! ভিতরবাড়িতে তার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কাকিমা কাল রাতে বোধ হয় ত্রিফলার জল দিতে ভুলে গেছেন। সেজোকাকা চেঁচিয়ে বলছেন, এখন সকালে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে কী করে? কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে দিনটাই যে মাটি!

সুন্দরীদের এইসব প্রসঙ্গ না শোনাই ভাল। তারা আলো আর বুলবুলির মতো জীবনের গাছে ডালে ডালে খেলা করবে। কোষ্ঠ পরিষ্কারের মতো বস্তুগত বিষয়ে তাদের না থাকাই উচিত।

আমি বললাম, আপনি এবার চলে যান। বেলা হয়েছে। আমার কাকা-কাকিমা উঠে পড়েছে।

ফুলচোর একটু ফিচকে হাসি হেসে কোচড়টা আগলে ফটকের দিকে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে বলল, আবার দেখা হবে কিন্তু।

হবেই তো। আমি জানি, দেখা হবে! বললাম, নিশ্চয়ই, রোজ আসবেন!

৬. কাটুসোনা

কাটুসোনা

সকালে কাক ডাকল কা, অমনি ফটকের কাছে ভিখিরিও ডাকল, মা!

বলতে কী সকাল থেকেই আমাদের বাড়িতে ভিখিরির আনাগোনা। প্রথম আসে রামশংকর। আমার জন্মের আগে থেকে আজ পর্যন্ত সে সপ্তাহে ক্যালেন্ডার ধরে তিন দিন আসবেই। সে এলেই বুঝতে পারি, আজ হয় সোম, নয়তো বুধ, না হয়তো শনিবার। রামশংকরকে সবাই চেনে হাঁটুভাঙা রামা বলে। দিব্যি স্বাস্থ্য। দোষের মধ্যে তার হাঁটু সোজা হয় না। বাঁকা হাঁটু নিয়ে খানিক নিলডাউন হয়ে সে হাটে। বেশ জোরেই। রামার আবার তাড়া থাকে। একবার-দুবার ডাকবে, মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে ভিক্ষে না পেলে সে ভারী রাগারাগি শুরু করে দেয়, আরে, এইসন হোলে আমার চলবে? আমারও তো পাঁচঠো বাড়ি যেতে হোবে, তার পোরে তো পেট ভোরবে! এ হো দিদি, ও মাইজি, এ বুডটা মাইজি, আরে ও খোকাবাবু...

ভিক্ষের চাল আলাদা একটা লোহার ড্রামে থাকে। তাতে জারমান সিলভারের একটা কৌটো। ভরভরন্ত এক কৌটো চাল পেয়ে রামশংকর গেল তো এল অন্নদা বুড়ি। তার নাম অবশ্য অন্নদা নয়। ম্যাট্রিকুলেশন বেঙ্গলি সিলেকশনে ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা ছিল, অন্নদার জরতী বেশে ব্যাস ছলনা। অন্নদা যে বুড়ির বেশ ধরে ব্যাসদেবকে ছলনা করে নতুন কাশীকে ব্যাসকাশী বানিয়েছিলেন এই বুড়ি হুবহু সেইরকম। ফটকের কাছে বসে মাথার উকুন চুলকোবে, ঘ্যানর ঘ্যানর করে সংসারের দুঃখের কথা বলবে, ভিক্ষেটা বড় কথা নয় তার কাছে, কথা বলতে পারলে বাঁচে। ভৈরবকাকা তার নাম দিয়েছেন অন্নদা বুড়ি।

বোবা মুকুন্দ আসে রোববার আর ছুটির দিনে। লোকে বলে সে ফাঁসিদেওয়ায় এক ইস্কুলে দফতরির কাজ করে। ছুটিতে ভিক্ষে করতে বেরোয়। সেও এক কৌটো চাল নেয়। আর আসে ছেলে কোলে নিয়ে মানময়ী। বলতে কী মানময়ীও তার নাম নয়। বছরের পর বছর সে একটা বছরখানেক বয়সের ছেলে কোলে নিয়ে আসছে দেখে একদিন ঠাকুমার সন্দেহ হয়। ঠাকুমা সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল, বলি ও মেয়ে, তোমার কোলের বাচ্চাটি কি সেই আগেরটাই? না কি একে আবার নতুন জোগাড় করেছে? এই শুনে মানময়ী কেঁদে আকুল, আমার পুয়ে পাওয়া বাচ্চাটাকে নিয়ে এত কথা কীসের তোমাদের? না হয় ভিক্ষেই দেবে, তা বলে কি আমাদের মান নেই? সেই থেকে মানময়ী। তবে আমরাও জানি মানময়ীর কোলের বাচ্চার বয়স বাড়ে না। একজন একটু বড় হয় তো ঠিক সেই বয়সী আর একটাকে কোত্থেকে জোগাড় করে আনে। কিন্তু সে কথা বলবে এত বুকের পাটা কার?

বাঁধা ভিখিরি দশ বারোজন। তাছাড়া উটকো ছুটকো আরও জনা বিশেক। কেউ শুধু হাতে ফিরবে না, মায়ের আর ঠাকুমার এই নিয়ম। পপি বেঁচে থাকতে সেও ভিখিরি দেখলে ঘেউ-ঘেউ করত না, বরং দৌড়ে এসে ভিতরবাড়ির খবর দিত।

ভিখিরি নানারকমের আছে। কেউ ফটকের ওপাশ থেকে হাত বাড়ায়, কেউ বা ভিতরবাড়িতেও আসে ভিখিরিপানা করতে। আমি বয়সে পা দিতে না দিতেই এরকম কয়েকজন ভিখিরির আনাগোনা শুরু হয়ে গেল।

একবার আমাদের পুরনো রেডিয়োটা খারাপ হওয়াতে হিলকার্ট রোড থেকে দাদা পন্টুদাকে নিয়ে এল।

পদা রেডিয়ো দেখবে কী, আমাকে দেখে আর চোখই সরাতে চায় না। সেদিনই মা’র সঙ্গে মাসিমা পাতিয়ে বাবাকে মেশো ডেকে ভিত তৈরি করে রেখে গেল। তারপর প্রায়ই সাইকেলে চলে আসে। পন্টুদার রেডিয়ো সারাই ছাড়া আর তেমন কোনও গুণ আছে বলে কেউ জানে না। বেশ মোটা থলথলে চেহারা। কথা বলার সময় শ্বসের জোরালো শব্দ হয়। হাসিয়ে দিলে হেসে বেদম হয়ে পড়ে।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পন্টুদা বিস্তর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বেচারা! কী দিয়ে চোখ টানবে তা বুঝতে না পেরে তার যে আর একটা মাত্র বাহাদুরি ছিল সেইটেই আমাকে দেখাতে চাইত। সেই বাহাদুরিটা হল খাওয়া। বকরাক্ষসের মতো এমন খেতে আমি আর কাউকে দেখিনি। মা আর ঠাকুমা লোককে খাওয়াতে ভালবাসে। পন্টুদা রোজ খাওয়ার গল্প ফাঁদে দেখে একদিন তাকে নেমন্তন্ন করা হল। দেড় সের মাংস আর সেরটাক চালের ভাত ঘপাৎ ঘপাৎ করে খেল পন্টুদা, আগাগোড়া আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে আর মৃদু মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে। খাওয়ার শেষে আমাকেই বলল, দেখলে তো কাটু, পারবে আজকালকার ছেলেরা এরকম? পঁচিশ খানা রুটি আর দুটো মুরগি আমি রোজ রাতে খাই।

মেয়েরা যে খাওয়ার ব্যাপারটা পছন্দ করে না এটা পন্টুদাকে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি। তাই এর পর থেকে পন্টুদা প্রায়ই বাইরে থেকে পাঁচ দশ টাকার তেলেভাজা কি পঞ্চাশটা চপ কিংবা পাঁচ সের রসগোল্লা নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসত। এ বাড়ির কেউ তেমন খাউন্তি নয়। দু'চারখানা সবাই মিলে হয়তো খেল, বাকিটা পন্টুদা। খেয়ে উদগার তুলে বলত, এখনও যতটা খেয়েছি ততটা আরও পারি। বুঝলে কাটু! খাওয়াটা একটা আর্ট!

পুরুষগুলো কী বোকা। কী বোকা! এরকম খেয়ে খেয়ে বছর দুইয়ের মধ্যে পন্টুদার প্রেসার। বেড়ে দুশো ছাড়াল। রক্তে ধরা পড়ল ডায়াবেটিসের লক্ষণ। মাথার চুল পড়ে পাতলা হয়ে গেল। গায়ের মাংস দুল-দুল করে ঝুলতে লাগল। মুখে বয়সের ছাপ পড়ে গেল। ডাক্তারের বারণে খাওয়া। দাওয়া একদম বাঁধাবাঁধি হল।

যখন আমি ক্লাস এইট কি নাইনে পড়ি তখন হঠাৎ একদিন অবনী রায় এসে হাজির। অবনীবাবু এ শহরের নামকরা পণ্ডিত লোক, ভাল কবিতা লেখেন, নিরীহ রোগা চেহারা। বয়স খুব বেশি নয়, তবে নিশ্চয়ই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। উদাস এবং অন্যমনস্ক মানুষ। চোখদুটো স্বপ্নে ভরা। এসে বাবার সঙ্গে বসে অনেক কথাটথা বললেন। তারপর আমাকে আর চিনিকে ডাকিয়ে নিয়ে পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলেন। নিজে থেকেই

আমাদের পড়ার ঘরে ঢুকলেন, বইপত্র ঘাঁটলেন, দু'-চারটে পড়া জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বাবাকে বললেন, আপনার মেয়েরা ইংরিজিতে কাঁচা। ঠিক আছে, কাল থেকে আমি ওদের পড়াব।

বলতে কী সেই প্রস্তাবে বাড়ির লোক হাতে চাঁদ পেল। অবনী রায় প্রাইভেট টিউশানি খুব অল্পই করেন। কারণ তাঁর পয়সার অভাব নেই। ওঁর বাবা শহরের মস্ত টিম্বার মার্চেন্ট। তবু মাঝে মধ্যে লোকে ধরলে উনি ছেলেমেয়েদের পড়ান। কিন্তু যাদের পড়ান তারা দুর্দান্ত রেজাল্ট করবেই। এই জন্য অবনী রায়ের চাহিদা ভীষণ। মারোয়াড়িরা দুশো আড়াইশো টাকা পর্যন্ত দিতে চায় ছেলেমেয়েদের জন্য ওঁকে প্রাইভেট টিউটর রাখতে।

বাড়ির সবাই এই প্রস্তাবে খুশি হলেও আমি আড়ালে আপন মনে জ্বালাভরা হাসি হেসে ঠোঁট কামড়েছি। অবনী রায় আমার দিকে এক আধ ঝলকের বেশি তাকাননি। কিন্তু আমি তো কিশোরী মেয়ে। আমি পুরুষের দৃষ্টি বুঝতে পারি।

তখনও ফ্রককই পরি। কখনও-সখনও শাড়ি। অবনী রায় এসে সকালবেলা অনেকক্ষণ পড়াতেন। কখনও কোনও বেচাল কথা বলেননি, চোখের ইশারা করেননি বা প্রয়োজনের চেয়ে এক পলকও বেশি তাকাননি মুখের দিকে। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে বগড়ি পাখি ডাকত। টের পেতাম।

মাসের শেষে টাকার কথা তুলল বাবা। অবনী রায় মৃদু হেসে বললেন, হি হি! কাটু আর চিনিকে টাকার জন্য পড়াই নাকি?

অবনী রায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আর কথা চলে না। অমন সম্মানিত লোককে টাকার কথা বলাটাও অন্যায়।

এইট থেকে আমি সেকেন্ড হয়ে নাইনে উঠলাম। চিনি তার ক্লাসে ফার্স্ট হল। জগদীশবাবু তখনও বিকেলে আমাদের পড়ানো খুব দেমাক করে বলে বেড়ালেন, দেখলে তো! গাধা

পিটিয়ে কেমন ঘোড়া করেছি। কিন্তু আমরা সবাই বুঝলাম কার জন্য আমাদের এত ভাল রেজাল্ট। জীবনে কখনও সেকেন্ড থার্ড হইনি আমি। সেই প্রথম।

ফাইনাল পর্যন্ত অবনী রায় আমাকে টানা পড়ালেন। আমি ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারি পেরোলাম। বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল। বাবা একটা খুব দামি শাল কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, অবনীর বাড়িতে গিয়ে এটা দিয়ে প্রণাম করে আয়।

সেই সন্ধেটা বেশ মনে আছে। অনীবাবু তার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। সব সময় বই-ই পড়তেন। শালটা পায়ের ওপর রেখে প্রণাম করে হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালাম। বরাবরই আমি একটু ফিচে। বললাম, আমি নয়, আপনিই ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করেছেন।

অবনীবাবু হাসিমুখে বললেন, কথাটার মানে কী দাঁড়াল?

আমি বললাম, আমার তো এত গুণ ছিল না। আপনিই করিয়েছে।

অবনীবাবু হাসছিলেন মৃদু মৃদু। নিজের র চুল টানার একটা মুদ্রাদোষ ছিল। দু'আঙুলে ডান দিকের ঘন দ্রু-র চুল টানতে টানতে বললেন, তা হলে তোমার আর আমার মিলিত প্রচেষ্টারই এই ফল।

নিশ্চয়ই।

এই প্রথম অবনী রায় প্রয়োজনের চেয়ে কিছু বেশি সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, এই মিলিত প্রচেষ্টা যদি বজায় রাখতে চাই তাহলে কি তুমি রাজি হবে?

আমি তো প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। দু-আড়াই বছর ধরে ওঁর কাছে পড়বার সময় মাঝে মাঝে সংশয় দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু মন বলত অন্য কোনও ব্যাপার আছে। কাজেই অবাক হইনি। তবু মুখটা বোকার মতো করে বললাম, কলেজের পড়াও পড়াবেন? খুব ভাল হয় তা হলে।

আমি সে কথা বলিনি। আমি তোমাকে পোব না। কিন্তু পড়ানো ছাড়াও কি অন্য সম্পর্ক হতে নেই? আরও ঘনিষ্ঠ কোনও আত্মীয়তা!

এ কথার জবাব হয় না। আমি তখন সতেরো বছরের যুবতী। উনি চল্লিশ ছুঁইছুঁই। বিয়ে করেননি বটে, তা বলে তো আর খোকাটি নন। আমি কথা না বলে আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসি।

পরদিন সকালেই শহরের একজন বিশিষ্ট প্রবীণ ভদ্রলোক মন্মথবাবু এসে হাজির। বাবার সঙ্গে হরেক কথা ফেঁদে বসলেন। তারপর বললেন, অবনী কাটুকে পড়াত। তা বলতে নেই, কাটু একরকম অবনীরই সৃষ্টি। পাত্রও চমৎকার। এমন পাত্র পাওয়া বিরাট ভাগ্য। আপনার ভাগ্য খুবই ভাল যে, অবনী এত মেয়ে থাকতে কাটুকেই পছন্দ করেছে। কাটুরও বোধ হয় অপছন্দ নয়। এখন আপনাদের মত হলেই শুভকাজ হয়ে যেতে পারে।

এই প্রস্তাবে বাড়ির সবাই একটু অবাক হল বটে, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় যে অবনী রায়ের মতো পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথাই। শোনা যাচ্ছে, অবনী অক্সফোর্ডে রিসার্চ করতে যাচ্ছেন, বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবেন। বাড়িতে সেই রাত্রে আলোচনা সভা বসল। অবনী রায়ের বয়স নিয়ে একটু খুঁতখুঁতুনি থাকলেও প্রস্তাবটা কারও অপছন্দ হল না। বয়সটাই তো বড় কথা নয়, অমন গুণের ছেলে কটা আছে?

বাড়ির সকলের মত হলেও আমি রাজি নই। যতবার অবনী রায়কে স্বামী হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করেছি ততবার নে যেন গা চিড়বিড়িয়ে উঠেছে। মনটা আক্রোশে ভরে গেছে। কেন লোকটা আমাকে বিয়ে করতে চায়? কেনই বা লোভের বশে আমাকে বিনা পয়সায় পড়াতে এসেছিল? দু’-আড়াই বছরের ঘটনা যত ভাবলাম ততই মনটা বিরুদ্ধে দাঁড়াল। গা ঘিন ঘিন করল।

আমি স্পষ্ট করেই বাড়ির লোককে বলে দিলাম, না।

আমার বাবা মা কেউই আমার মতের ওপর মত চাপাল না। বাবা পরের দিন মন্মথবাবুকে একটু নরম সরম করে, প্রলেপ মাখিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমাদের অমত ছিল না, কিন্তু কাটুরও তো একটা মত আছে। ও এত শিগগির বিয়েতে রাজি নয়। সবে তো ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। তা ছাড়া পড়াশুনোরও ইচ্ছে খুব।

মন্মথবাবু বাবার কথাকে পাত্তাই দিলেন না। বললেন, আরে ওটুকু মেয়ের আবার মতামত কী? এ সুযোগ কি আবার আসবে? অবনীরও তো আর আইবুড়ো থাকা চলে না। পড়াশুনো করবে বেশ ভাল কথা। সে তো অবনীও চায়। বিলেতে গিয়ে পড়াবেই তো। ঠেকছে কোথায় তা হলে?

বাবা এ কথায় খুব ফাঁপড়ে পড়ে গেলেন। কিছু বলার ছিল না। কয়েকদিন বাদে অনী রায়ের মা বাবা আমাকে দেখতেও এলেন। দুজনেই কিছু গম্ভীর। আমি সামনে যেতে চাইনি, কিন্তু বাড়ির সম্মান এবং ওঁদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা ভেবে যেতে হল। সামনে গিয়ে বুঝলাম, অবনী রায়ের মা বাবাও এই সম্বন্ধ তেমন পছন্দ করছেন না। ভদ্রলোক চুপ করেই রইলেন, ভদ্রমহিলা দু’-চারটে কাটা ছাঁটা কথা বললেন, অবনীর তো কত ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে সব মেয়েই তো যেতে চায়। ছেলের মতিগতি কিছু বুঝতে পারি না বাবা..ইত্যাদি। একটু ফাঁকাভাবে উনি আমাকেই জানিয়েই দিচ্ছিলেন যে, অবনী রায়ের মাথা খেয়ে কাজটা আমি ভাল করিনি।

অবনী অবশ্য আর কখনও আমাদের বাড়িতে আসলে না। আমার সঙ্গে দেখা করারও কোনও চেষ্টা করতেন না, সেদিক দিয়ে খুব ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু মন্মথবাবু রোজ আসতেন তাগাদা দিতে, বলতেন, কই মশাই, আপনারা এমন নিস্তেজ হয়ে থাকলে চলবে কেন? উদযোগ নেই কেন? পাকা কথার দিন স্থির করুন। আশীর্বাদ হয়ে যাক।

আমি বাড়ির লোককে আবার বললাম, না।

অবশেষে বাবা মন্মথবাবুকে বলতে বাধ্য হলেন, কাটু রাজি নয়। তবে আমাদের অমত নেই। আপনারা কাইকে রাজি করাতে পারলে আমরাও রাজি। মেয়ের অমতে কিছু করতে পারব না।

সেই থেকে শুরু হল মন্মথবাবুর আমাকে রাজি করানোর প্রাণপণ চেষ্টা। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন প্রবীণ মানুষও এসে জুটলেন। কলেজে, পাড়ায় গোটা শহরেই রটে গিয়েছিল, অনী রায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে। রাগে, আক্রোশে আমার হাত-পা নিশপিশ করত। কারা রটিয়েছিল জানি না, কিন্তু তাদের মতলব ছিল। সেই সময় অবনী মন্মথবাবুর হাত দিয়ে আমাকে প্রথম একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটা না পড়েই আমি মন্মথবাবুর চোখের সামনে ছিঁড়ে ফেলে দিই।

অবনী বুঝলেন, আমি সত্যিই রাজি নই। চিঠি ছিঁড়ে ফেলার এক মাসের মধ্যেই অনী বিয়ে করলেন গার্লস স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী অমিতাদিকে। যেমন কালো, তেমনি মোটা। তার ওপর দাঁত উঁচু, ঠোঁট পুরু এবং যথেষ্ট বয়স্কা। অমিতাদিকে বেছে বের করে অবনী বিয়ে করেছিলেন বোধ হয় আমার ওপর প্রতিশোধ নিতেই। নইলে ওরকম কুচ্ছিত মেয়েকে বিয়ে করার অন্য কোনও মানেই হয় না।

বিয়ের নেমন্তন্নে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই গিয়েছিলাম। অবনীবাবু আমাকে ভিতরের একটা ঘরে ডেকে নিয়ে একগোছা রজনীগন্ধা হাতে দিয়ে বললেন, কার সঙ্গে আমার বিয়ে হল জানো তো।

জানি। অমিতাদি।

অবনীবাবু হাসছিলেন। সেই মৃদু অদ্ভুত হাসি। বললেন, মোটেই নয়! বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখো।

ভেবে দেখার কিছু ছিল না। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বিরক্ত হয়েছিলাম মাত্র।

অবনীবাবু অমিতাদিকে নিয়ে বিলেত যাননি। কালিম্পং-এ একটা মিশনারি স্কুলে দু'জন চাকরি করেন।

এইরকম ভিখিরির হাত বার বার আমাকে চেয়েছে। সব কথা বলতে নেই। বলা যায় না। কারণ আমি তো সব ভিখিরিকেই ফিরিয়ে দিইনি। এক একটা ডাকাত ভিখিরি আসে। হম্বিতম্বি করে কেড়ে নিয়ে যায়।

বাইরে থেকে আমাকে যতই সুখী আর শান্ত দেখাক, ভিতরে ভিতরে আমার অসহ্য ছটফটানি। যতই ভিতরের উতরোল সেই ঢেউ চেপে রাখি ততই আমি বদমেজাজি হতে থাকি, মন তত খিঁচড়ে থাকে। এই ছটফটানি কোনও কাম নয়, প্রেমও নয়। শুধু এই বাঁধানো সুন্দর জীবন থেকে একটু বাইরে যাওয়া, একটু বেনিয়মে পা দেওয়ার ইচ্ছে।

আমার ভিতরে এক বদ্ধ পাগলির বাস। সারাদিন হোঃ হোঃ করে হাসতে চায়, হাউমাউ করে কাঁদতে চায়। তার ইচ্ছে একদিন রাস্তার ধুলো খামচে তুলে সারা গায়ে মাখে। মাঝে মাঝে সে ভাবে, যাই গিয়ে নাপিতের কাছে বসে ন্যাড়া হয়ে আসি। রাস্তার ওই যে নাক উঁচু একটা লোক যাচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ওর নাকটা একটু ঘেঁটে দিলে কেমন হয়? নিজের গায়ে চিমটি দিলে খুব লাগে? দিয়ে দেখি তো একটু উঃ বাবা! জ্বলে গেল! মদ খেয়ে যদি মাতাল হই একবার! যদি সাতজন বা-জোয়ান মিলিটারি আমাকে তাদের ব্যারাকে টেনে নিয়ে যায়!

এইসব নিয়মভাঙা কথা সেই পাগলি সব সময়ে ভাবছে। যত ভাবে তত গা নিশপিশ করে, হাত-পা গুলশুল করে, মন গলায় দড়ি বাঁধা হনুমানের মতো নাচতে থাকে।

মল্লিকবাড়ি থেকে সকালে যে একরাশ ফুল চুরি করে এনেছিলাম তা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই ছিঁড়েছি, ছিটিয়েছি। চুরির কোনও মানেই হয় না।

পাগলা দাশু একদম স্মার্ট নয়, কে বলবে কলকাতার ছেলে! জলজ্যান্ত আমাকে সামনে দেখে একদম ঘাবড়ে গিয়েছিল! পুরুষের চোখ আমার ভীষণ চেনা, ওর নজর দেখেই

বুঝে গেছি ও আর একটা ভিখিরি। পাগলা দাশু জানে না যে, ও আমার ভাবী দেওর। জানলে হয়তো আজ সকালে একটা প্রমাণই পেয়ে যেতাম।

আমাদের বাড়িতে এতকাল প্রেশার কুকার ছিল না। মা আর ঠাকুমা দু'জনেরই ওসব আধুনিক জিনিস অপছন্দ। তারা সাবেকি ঠাটেই বেশি স্বস্তি পায়। তবু কাল রাতে বাবা একটা বিরাট প্রেশার কুকার কিনে এনে বলল, সকলেই বলছে, এ হল একটা স্ট্যাটাস সিম্বল। রান্নাও নাকি চমৎকার হয়, খাদ্যগুণ বজায় থাকে, সময় কম লাগে।

শুনে ভৈরবকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, সব জোচ্চোর। তোমাকে যাচ্ছেতাই বুঝিয়ে, কৃত্রিম অভাববোধ তৈরি করেছে। এটাই হল এখনকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি। মনোহারী বিপণিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি রোজ দেখি, গাড়ল মানুষগুলো এসে যত আননেসেসারি জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আফটার শেভ লোশন, টুথপিক, মাস্টার্ড, কর্নফ্লেক্স, আইব্রো পেনসিল, লিপস্টিক, লোমনাশক, শ্যাম্পু, মাথা-মুন্ডু। পকেটের পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। ফিটকিরি দিয়ে যে কাজ হয়ে যায়, তার জন্য গুচ্ছের টাকা দিয়ে গাড়ল ছাড়া আর কেউ আফটার শেভ কেনে? সোজা কথা তোমার প্রয়োজন থাক বা না থাক তোমার প্রয়োজনের বোধটা জাগিয়ে দিতে পারলে ইউ বিকাম এ পারফেক্ট গাড়ল।

ভৈরবকাকা আমাদের কাকা নয়, আত্মীয়ও নয়, বাবার চেয়ে বয়সে অন্তত দশ বছরের বড়। তবে অনাশ্রিত ভালমানুস ভৈরবকাকা বহুকাল আমাদের সংসারে আছেন। আমাদের আপন কাকাদের চেয়ে ভৈরবকাকা কম আপন নন। যশোরে কিছু জমিজমা ছিল। সম্পত্তি বদল করে আমবাড়ি ফালাকাটায় বেশ অনেকটা চাষের জমি পেয়েছেন। খানিকটা বাস্তুভিটেও। সেই আয়ে তার চলে, আমাদের সংসারেও অনেক দেন। বিয়ে-টিয়ে কোনওকালে করেননি। এক জমিদারের মেয়েকে সে আমলে ভালবেসে ফেলেছিলেন কিন্তু বিয়ে না হওয়ায় সতেরোবার দেবদাস পড়ে মদ খাওয়া ধরলেন। মদ সহ্য হল না, আমাশা হয়ে গেল। তারপর নামলেন দেশের কাজে। বিস্তর বেগার খেটে কখনও মোনাশিনী ক্লাব, কখনও কখনও কচুরিপানা উদ্ধার সমিতি, কখনও ম্যালেরিয়া অভিযান সংঘ, কখনও সর্বধর্ম সৎকার সমিতি বা কখনও নিখিল ভারত শীতলপাটি শিল্পী মহাসংঘ

তৈরি করেছেন। কোনওটাই টিকে নেই। তবে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করেন। তার ভয়ে এখনও এ বাড়ির কেউ টুথপেস্ট বা টুথব্রাশ ব্যবহার করে না। দান বা ঘুঁটের ছাই দিয়ে আমরা দাঁত মাজি। লিপস্টিক পারতপক্ষে মাখি না। তবে লুকনো একটা থাকে, বিয়েবাড়ি-টাড়ি যেতে গোপনে লাগিয়ে যাই।

আজ সকাল থেকে ভৈরবকাকা আবার প্রেশার কুকারের পিছনে লেগেছেন। তার অবশ্য কারণও আছে। প্রেশার কুকারে রান্না হবে বলে বাবা আজ বাজার থেকে দুই কেজি খাসির মাংস এনেছে। অত মাংস আমরা দু'দিনেও খেয়ে ফুরোতে পারব না। মাংসের পরিমাণ দেখে মাও চেঁচামেচি করছে। বাবা কিছু অপ্রতিভ।

ভৈরবকাকা বললেন, ওই যে গল্প আছে, এক সাধু লেংটি বাঁচাতে বেড়াল পুল, বেড়াল খাওয়াতে গোর কিনল, আর ওই করতে করতে ঘোর সংসারী হল! এ হল সেই প্রস্তাব। প্রেশার কুকার কিনলে তো মাংস আনতে হল। এই কাড়ি মাংস বাঁচাতে এরপর না আবার তুমি ফ্রিজ কিনতে ছোটো!

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে, ফ্যাদরা প্যাচাল পেড়ো না তো ভৈরবদা। প্রেশার কুকারটা বেশ বড় বলেই আমি একটু বেশি মাংস কিনে ফেলেছি। না হয় নিজেরা আজ একটু বেশি করেই খাব। বেয়াই বাড়িতেও পাঠানো যাবে।

ভৈরবকাকা চটে উঠে বললেন, তোমার খুব টাকা হয়েছে, না? তাই ওড়াচ্ছো? কেন প্রেশার কুকার ছাড়া এতদিন কি আধসেদ্ধ ডাল আর আধকাঁচা মাংস খেয়ে এসেছ!

এসব কথায় মা ঠাকুমা ভৈরবাকার পক্ষে।

বাবাকে একা দেখে আমি তার পক্ষ নিয়ে বললাম, মানুষের শখ বলেও তো একটা জিনিস আছে! টেকনোলজি যত ডেভেলপ করবে তত আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন চাই।

হু।- ভৈরবকাকা রাগে গরগর করতে করতে বলে, ওসব হচ্ছে বিজ্ঞাপনের শেখানো কথা। আরও কত কথা আছে! বলে কিনা, প্রেশার কুকার হল নারীদের রান্নাঘর থেকে মুক্তি। ফ্রিজ মানে জিনিসের সাশ্রয়। এসব হচ্ছে অটোসাজেন। মানুষের মগজে কথাগুলো ক্রমে ক্রমে সেট করে দেওয়া। উন্মাদের মতো কাখ খুলে মানুষ জিনিসও কিনছে বাপ!

প্রেশার কুকার হুইসিল দিতেই মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল, ও বাবা, এ আবার ফেটে-ফুটে না যায়। কাটু তুই বরং দ্যাখ। আমার অভ্যেস নেই।

মাংস রাঁধতে গিয়ে কী করে যে মনটা আবার ভাল হয়ে গেল কে জানে!

৭. পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

আমি একটা পাথরের চাতালে বসে আছি। বহু নীচে বাগরাকোটে যাওয়ার পিচের রাস্তার একটা বাঁক মাত্র চোখে পড়ে। তারও হাজার ফুট নীচে কোনও শাখানদীর জল সরু সুতোর মতো দেখা যায়। কিছুক্ষণ আগে বাগরাকোটমুখো এক লরি থেকে নেমে আমি যখন এই পাহাড়টা আবিষ্কার করতে শুরু করেছিলাম তখন এক কাঠরে, পাহাড় থেকে নামবার মুখে আমাকে বলল, সাবধানে যাবেন। ওপরে একটু আগেই আমি মস্ত এক সাপ দেখেছি। সাপের ভয়ে আমি থেমে থাকিনি। বর্ষায় পিছল সরু একটু পথের আভাস মাত্র পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে। আলগা মাটি আর নুড়ি পাথরে কেডসে রবার শোল কামড়ে ধরে না বলে বারবার পা হড়কে যায়। ক্রমশ ভার হয়ে ওঠে চায়ের ফ্লাস্ক, জলের বোতল আর পাউরুটি এবং কলা বওয়ার ঝোলা ব্যাগ। লোহার নাল বসানো লাঠিখানা পর্যন্ত বোঝা বলে মনে হয়। মেধভাঙা চড়া রোদের গরমে সারা গা ঘামে সপসপে ভেজা। খাস ঘন ও গরম। বুকে হাফ।

অনেকটা উঠে এই পাথরের জিভ বের করা ব্যালকনি পাওয়া গেল। বেশির ভাগ গাছ লতা বা ঝোপ আমি চিনি না, বহু ফুল জন্মেও দেখিনি, বহু নতুন রকমের পাখির ডাক কানে আসছে। তাই যে কোনও পাহাড়ে ওঠাই আমার কাছে আবিষ্কারের মতো। পাহাড়ের চূড়া ঘন জঙ্গলে ঢাকা। তাই আর কতটা আমাকে উঠতে হবে তা বুঝতে পারছি না। তবে উঠব। উঠবই।

ফ্লাস্কের ঢাকনায় চা ঢেলে চুমুক দিই। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। উঁচু থেকে আমি দক্ষিণের দিকে উদাস চোখে চেয়ে থাকি। দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের খাড়ির ভিতর দিয়ে বহুদূরে এক ফালি সমতল দেখা যায়। রোদে ধু ধুকরা, দিগন্ত পর্যন্ত গড়ানো। এদিকে কলকাতা, যেখানে আমার জন্ম, যেখানে আমি একাল বেড়ে উঠেছি একটানা।

হায়, আজ সকালে কলকাতার স্মৃতি আরও আবছা হয়েছে মনে করতে গিয়ে দেখি, ধর্মতলা দিয়ে মহানন্দা বয়ে যাচ্ছে। হাওড়ার পোলের ওপর গন্ধরাজের বাগান। শ্যামবাজারের দিকে বিশাল, নীলবর্ণ পাহাড় উঁচু হয়ে আছে। সায়ন্তনীর কপালটাও আজ মনে পড়ল না। যতবার ভেবেছি ততবারই দেখি, খুব ফরসা চেহারার একটা মেয়ে, লম্বাটে চেহারা, চোখদুটো ভীষণ উল। সায়ন্তনী ওরকম নয় মোটেই। সে ছোটখাটো রোগা, শ্যামলা এবং সাধারণ। জোর করে আবার মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে যে শ্যামলা এবং ছোটখাটো মেয়েটিকে দেখতে পেলাম সেও সায়নী নয়। ভাল করে লক্ষ করলে হয়তো লিচুর মুখের আদল আসত। আমি তাই ভয়ে চোখ খুলে ফেলি।

কাল লিচুদের বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোর নেমন্তন্ন ছিল। হারমোনিয়াম ফেরত দেওয়ার পর এই প্রথম ওদের বাড়ি যাওয়া। বাড়িতে কাল অনেক এভিগেন্ডি কাচ্চাবাচ্চা আর গ্রাম্য মহিলাদের ভিড় হয়েছিল। দু’বাটি শিন্নি খাওয়ার পর লিচু আমাকে এসে চোখ পাকিয়ে বলল, কী হচ্ছেটা কী? কাঁচা আটার শিন্নি অত খেলে পেট খারাপ করবে যে।

আমি জীবনে কখনও শিমি খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কলকাতার বাড়িতে বা আশেপাশে কখনও সত্যনারায়ণ পুজোও হয়নি, বললাম, খেতে বড় ভাল তো!

ভাল বলেই কী? শিন্নি অত খেতে নেই।

আমি হতাশ হয়ে বাটিটা ফেরত দিই। কাঁঠাল, আম আর নারকেল মেশানো চমৎকার জিনিসটা আমি আরও দু’বাটি খেতে পারতাম। বললাম, তাহলে থাক।

অমনি আমার ওপর মায়া হল লিচুর। বলল, আহা রে, কিন্তু কী করি বলুন তো? এ জিনিস আপনাকে বেশি খাওয়াতে পারি না।

লিচু গিয়ে কিছুক্ষণ বাদেই আবার ফিরে এল।

বলল, সত্যিই আরও খেতে ইচ্ছে করছে?

আমি লাজুক মুখে বললাম, না, থাকগে।

দেখুন তো, আপনার আরও শিন্নি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, অথচ আমি আপনাকে খেতে দিইনি শুনে মা খুব রাগ করছে।

খচ্ করে একটা অম্বলের টেকুড় উঠল। পেটটাও বেশ ভরা ভরা লাগছিল ততক্ষণে। আমি বললাম, আমি আর খাবও না।

লিচু আমার মুখের দিকে খরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, অম্বল হয়নি তো! দাঁড়ান জোয়ান এনে দিই।

আবার দৌড়ে চলে গেল। জোয়ান নিয়ে ফিরে এল।

কিছুক্ষণ বাদে এসে আবার জিজ্ঞেস করল, এখন একটু ভাল লাগছে? বড় বাটির দু'বাটি শিন্নি, যা ভয় হচ্ছে না আমার।

এক ঘর লোকের মধ্যেই এইসব করল লিচু।

মাঝখানে একবার ওর বাবা এসে খুব হেঁ হেঁ করে গেল খানিকক্ষণ। বলল, ঘরদোর আজ সব লিচই সাজিয়েছে। বড় কাজের মেয়ে।

ঘরদোরে অবশ্য সাজানোর কোনও লক্ষণ ছিল না। তবু আমি মাথা নেড়ে ই দিলাম।

এক ফাঁকে লিচুর মাও এসে দেখা করে গেলেন। বললেন, নিজে সবাইকে যত্ন আত্তি করতে পারছি না বাবা, কিছু মনে কোরো না। লিচুর ওপরেই সব ছেড়ে দিয়েছি। সে তোমার যত্ন আত্তি করেছে তো? তুমি অবশ্য ঘরের মোক।

এই সব কথাবার্তা এবং হাবভাবের মধ্যে আমি সুস্পষ্টই একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাই। পশুপতি খুব মিথ্যে বলেনি হয়তো।

সত্যি কথা বলতে কী, লিচুকে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু কেন খারাপ লাগে না তাই ভেবে ভেবে আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে আজকাল। নিজের ওপরে ক্রমে রেগে যাই। লিচুকে খারাপ লাগাই তো উচিত, তবে কেন খারাপ লাগছে না আমার। চোরা নদীর স্রোতে তবে কি তলে তলে ভূমিক্ষয় হল আমার! এরপর একদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ব?

জোৎস্নারাত্রি ছিল কাল। ফিরে আসার সময় লিচু আমাকে অনেকটা এগিয়ে দিল।

এখানকার জ্যোৎস্নাও কী সাংঘাতিক! সার্চ লাইটের মতো এমন স্পষ্ট ও তীব্র জ্যোৎস্না আমি খুব বেশি দেখিনি। এ যেন চাঁদের বিস্ফোরণ। আদিগন্ত পাহাড় পর্বত জ্যোৎস্নার মলমে মাখা। সেই জ্যোৎস্নায় পরির ছদ্মবেশ ধরেছিল লিচু। বলল, আপনার জন্য আমাকে সেদিন কাটুর কাছে কথা শুনতে হল।

আমি অবাক হয়ে বলি, কাটু আবার কে?

ও মা! অমিতদার ভাবী বউ, রায়বাড়ির মেয়ে। চেনেন না?

না তো। কেউ আমাকে বলেনি। অমিতদার কি বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?

কবে!- লিচু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে পরিচয়ও নেই! সত্যি বললেন?

আমি মিথ্যে বড় একটা বলি না।

লিচু খুব চোখ টেরে বলল, কিন্তু আপনার জন্য খুব দরদ দেখলাম যে। আপনি না চিনলেও কাটু আপনাকে ঠিকই চেনে। কত কথা শোনাল আপনার হয়ে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার হয়ে তোমাকে কথা শোনানোর কী? কেনই বা শোনাচ্ছে?

সেই হারমোনিয়াম।

হারমোনিয়ামের পাট তো চুকে গেছে। আমি গান গাওয়া ছেড়েও দিয়েছি। আর এ হল আমার নিজের ব্যাপার, এতে অন্য কারও মাথা ঘামানোর কথা নয়।

কাটু হয়তো ভাবী দেওরের স্বার্থ ভেবেই বলেছে।

মেয়েটাকে চিনিয়ে দিয়ো। বকে দেব।

ও বাবা!- লিচু ভয়-খাওয়া হাসি হেসে বলল, কাটুকে বকার সাহস কারও নেই। যা দেমাক!

খুব দেমাক নাকি?

ভীষণ। অবনী রায়ের মতো পাত্রকেই পাত্তা দেয়নি।

দেমাক তোমারও আছে। আমি মেয়েদের দেমাক পছন্দ করি।

আহা, আমার দেমাক দেখলেন কোথায়?

দেখেছি। যার আছে সে বোঝে না। অবনী রায়টা কে?

শচীবাবুর ছেলে। বিরাট বড়লোক। তার ওপর খুব শিক্ষিতও বটে। কাটু হায়ার সেকেন্ডারিতে ফাস্ট ডিভিশন পেয়েছিল ওঁর জন্যই তো! সেই কৃতজ্ঞতাবোধটুকু পর্যন্ত কাটুর নেই। বয়সের অবশ্য একটু তফাত ছিল, কিন্তু তাতে কী?

কাটুর জায়গায় তুমি হলে অবনী রায়কে বিয়ে করতে?

লিচু মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে চোখের ছোবল মারল। বলতে নেই লিচুর চোখদুটি বিশাল। বলল, হঠাৎ আমার কথা কেন?

সব জিনিস নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভাবতে হয়, তবে বোঝা যায় অন্যে কেন কোন কাজটা করল বা করল না।

লিচু হেসে বলল, কাটুর মতো কপাল কি আমার! আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ বিয়েই করতে চায়নি। তাহলে কী করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভাবব বলুন!

আমি বললাম, এ কথাটা সত্যি নয় লিচু।

লিচু মাথা নিচু করল হঠাৎ। তারপর মাথা তুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আমরা একটা মাঠের ভিতর পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে হাটছিলাম। সকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাঠে অল্প-স্বল্প কাদা ছিল। দু'ধারে দুটো সাদা বাঁকাচোরা গোলপোস্ট। জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছিল চারিধার।

লিচু ফিসফিস করে বলল, হ্যাঁ, চেয়েছিল। তাতে কী?

তুমি কি তাদের পাত্তা দিয়েছ?

লিচু মাথা নেড়ে হেসে বলে, পাত্তা দেওয়ার মতো নয়।

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, দেমাক কারও কম নয় লিচু।

দুই গোলপোস্টের মাঝামাঝি জ্যোৎস্নার কুহকে আমাদের মতিচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। লিচু টলটলে জ্যোৎস্নায় বোয়া স্বপ্নাতুর দুই চোখ তুলে তাকাল। জাদুকর পি সি সরকাররাত দিয়ে মেয়ে কাটার আগে যেভাবে তাকে সম্মোহিত করতেন অবিকল সেই সম্মোহন আমার ওপর কাজ করছিল।

লিচু ধরা গলায় বলল, দেমাক। আমাদের আবার দেমক!ী আছে বলুন তো আমার দেমাক করার মতো?

দেমাকের জন্য কিছু থাকার দরকার হয় না। শুধু দেমাক থাকলেই হয়। দেমাক থাকা ভাল লিচু, তাহলে আজেবাজে আমার মতো লোককাহ যেতে পারে না।

ভুল হয়েছিল, বড় ভুল হয়েছিল ওই কথা বলা। জ্যোৎস্না ঢুকে গিয়েছিল মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে। চোখের সম্মোহন ছিল বড়ই গভীর। মাথায় ছিল মি।

লিচু ঠিক সেন্টার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুৰতুলে স্পষ্ট করে চাইল আমার দিকে। বলল, তাই বুঝি?

আমি একটা সাদা গোলপোস্টের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। ওই গোলপোস্টে আমার হাত ফসকে কতবার গোলে বল ঢুকে গেছে। ছেলের বলে, পাগলা দাও এত গোল খায় যে বাড়িতে গিয়ে আর ভাত খেতে হয় না।

আমি বললাম, তাই নয় বুঝি?

লিচু মাথা নত করে বলল, আমি বুঝি তোমাকে যেতে দিই না? আর কীভাবে বোঝাব বলো তো? বোকা কোথাকার!

এত সুন্দর গলায় বলল যে, জ্যোৎস্না আর একটু ফরসা হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, আকাশ থেকে চাঁদটা গড়িয়ে পড়ল মাঠের মধ্যে। পড়ে লাফাল বার কয়েক কে যে চাঁদটাকে ফুটবলের মতো শট করল তা বোঝা গেল না। কিন্তু পশ্চিম ধারের গোলপোস্টে সেটা কোনাকুনি ঢুকে গেল বিনা বাধায়। আমি হাত বাড়িয়েও গোল আটকাতে পারলাম না।

কিন্তু নেপথ্যে একটা গলার স্বর বারবার আমাকে কী যেন প্রম্পট করছিল। ফিসফিস করে খুব জরুরি গলায় বলছিল, বলুন। বলুন। এই বেলা বলে ফেলুন।

লিচু নতমুখ তুলে একটু হাসল।

আমি হাত বাড়িয়ে লিচুর একটা হাত ধরলাম। গলা আমারও ধরে এসেছে। বুকের মধ্যে দ্বন শ্বস। বললাম, লিচু, আমি যে তোমাকে...

ঠিক এই সময়ে আমার মাথার মধ্যে লাউড স্পিকারের ভিতর দিয়ে প্রম্পটার বলে উঠল, না।! মনে নেই কী শিখিয়ে দিয়েছিলাম।

আমি চিনলাম। আমার মাথার মধ্যে প্রম্পট কমছে পশুপতি। পশুপতি তাড়া দিয়ে বলল, আহা! টাকার কথাটা বলুন। বলুন!

আমি লিচুর দিকে চেয়ে যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা গিলে ফেলে নতুন করে বললাম, লিচু, তোমার বাবার কাছে আমি এখনও একশো পঁচাত্তর টাকা পাই।

লিচুর হাত চমকে উঠে খসে গেল আমার মুঠো থেকে।

আমি ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করি এবং পাথরের চাতাল ছেড়ে আবার পাহাড়ে ওঠা শুরু করি। এর চূড়ায় আমাকে উঠতেই হবে।

রাস্তাটা আর দেখতে পাই না। গাছের গোড়ায়, পাথরে বহুকালের পুরোনো শ্যাওলা। লতাপাতায় জড়ানো ঘন গাছের জল। পথ নেই। ডাইনে বাঁয়ে খুঁজে অবশেষে আমি একটা নোরার সন্ধান পেয়ে যাই। এখনও তেমন বর্ষা শুরু হয়নি বলে জলধারা প্রবল নয়। ঝিরঝির করে কয়েকটা সরু ধারা নেমে যাচ্ছে। খাত বেয়ে আমি উঠতে থাকি। বড্ড খাড়াই। পা রাখার জায়গা। পাই না। ফলে আবার জঙ্গলে ঢুকে যেতে হয়। আদাড় বাদাড়ি ভেঙে প্রাণপণে শুধু উঁচুতে ওঠা বজায় রাখি।

কিন্তু না উঠলেই বা কী?

পায়ের ডিম আর কুচকিতে অসহ্য শিরার টান টের পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবি। উপরে উঠে আমি কিছু পাব না। না পাহাড় জয়ের আনন্দ, না ব্যায়ামের সুফল।

উপর থেকে একটা ঘটানাড়া পাখির ডাক আসছিল। তীব্র, উঁচু একটানা, অবিকল পুজোর ঘণ্টার মতে। সেই ধ্বনির মধ্যে বারবার একটা না না না না' শব্দ বেজে যাচ্ছে। জীবন কিছু না, প্রেম কিছু না, অর্থ কিছু না, মায়া মোহ কিছুই কিছুনা।

আমি মাটিতে রাখা কেডস জোড়ার দিকে চেয়ে থাকি নতমুখে। কিছুই নেই, তবু জীবন তো যাপন করে যেতেই হয়। আমি একটু দম নিই, তারপর ধীরে ধীরে আবার উঠতে থাকি।

যখন চড়াই শেষ হল তখন বুঝতে পারলাম, আমি চূড়ায় উঠেছি। একরত্তি দম নেই বুকে, শরীরে এক ফোঁটা জোরও নেই আর। কপাল থেকে বৃষ্টির মতো ঘাম নামছে, পিঠ বুক বেয়ে ঘামের পাগলা ঝোরা। চারদিকে ঘন কালচে সবুজ জঙ্গল। কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। এতদূর উঠে কোনও তৃপ্তি বা আনন্দও বোধ করি না। বেল শরীর আর মন ভরা বিরক্তিকর এক ক্লান্তি।

ছোট একটা চৌকো পার হয়ে তার ওপর বসলাম। মনের মধ্যে ঘোর এক বৈরাগ্য ধীরে ধীরে ঢুকে যেতে লাগল। বুঝতে পারছি, আমি আর কলকাতার কেউ নই, কলকাতাও আমার কেউ নয়। বুঝতে পারি, আমি সায়ন্তনীকে ভাবাসি না, লিচুকেও না।

ভাবতে ভাবতে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ি।

দিন সাতেক বাদে আবার ফুলবাগানে চোর এল। আমি আজকাল সকালে উঠে কলকাতা বা সায়নীর কথা ভাববার চেষ্টা করি না। তোরকে চুম ভেঙে গেলে জানালার কাছে বসে ব্রোঞ্জ রঙের পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকি। ঘোর অন্ধকার থেকে ক্রমে ফিকে অন্ধকার। আকাশের গায়ে পাহাড় হঠাৎ আবছা জাহাজের মতো জেগে ওঠে। আমার সমস্ত শরীরে ভয় আর শিহরন খেলে যায়।

আস্তে আস্তে ব্রোঞ্জ সোনা হয়, তারপর রুপোর রং ধরে।

আজ অবশ্য দেখার কিছুই ছিল না। গত সাতদিন এক আদিম হিংস্র বৃষ্টি গিলে রেখেছিল শহরটাকে। এই শহর যথেষ্ট উঁচু বলে বন্যা হয় না। তবু রাস্তায় ঘাটে জল জমে আছে। আশপাশ থেকে পাহাড়ি নদীতে ভয়াবহ বানের খবর আসছে। শহর ডুবছে, গাঁ ডুবছে, চাষের জমিতে গলা বা মাথা ছাড়িয়ে জল।

কাল রাতে বৃষ্টি ছেড়েছে। সু ন মেঘে আকাশ ঢাকা, উত্তরে পাহাড় বলে যে কিছু ছিল তা আর বোঝাই যায় না। তবু অভ্যাসবশে আমি রোজই উঠে বসে থাকি ভোরে।

আজও যেমন, মেঘলা দিনের মলিন ভোরের আলো কষ্টেসৃষ্টে অনেক চেষ্টায় যখন চারদিক সামান্য ভাসিয়ে তুলেছে তাই ফুলচোর এল। আগের বারের মতোই ডাকাবুকো হাবভাব। শব্দ করে ফটক খুলল, চোরদের মতো ঢাক গুড়গুড় নেই। ভয় ভীতি নেই। এ কেমন চোর?

ধরা পড়ার ভয়ে বরং আমিই দেয়ালের দিকে সরে দাঁড়িয়ে চুপিসারে দেখতে থাকি। আজ কীইবা চুরি করবে ফুলচোর? বাগানে গোড়ালি ডুব জল, জলের নীচে থকথকে কাদা। হিংস্র বৃষ্টিতে একটাও আস্ত ফুল টিকে থাকতে পারেনি গাছে। বহু গাছ শুয়ে পড়েছে মাটিতে। জলে আধাবো, কাদায় মাখামাখি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! ফুলচোর আমার জানালার ধারের ঝুমকো লতার ঝোপের মধ্যে মাথা নিচু করে ঢুকে আসে যে! চুপি চুপি জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

শুনছেন?

সেই ডাকে আমার হাত পা কেঁপে ওঠে। ধরা পড়ে যাই। জানালার সামনে সরে এসে বলি, শুনছি! বলুন।

আপনি জেগে ছিলেন?

আমি খুব ভোরে উঠি। এ সময়টায় রোজ আমি পাহাড় দেখি।

তবে আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন কেন?

চোর ধরার জন্যই লুকোতে হয়।

ফুলচোর হাসল একটু। বলল, কিন্তু আমি তো ধরা পড়তে ভয় পাই না, পালিয়েও যাই না। আমাকে ধরতে লুকোতে হবে কেন?

কথাটা ভেবে দেখার মতো। বাস্তবিকই তো আমি চোর ধরার জন্য লুকোইনি, লুকিয়েছি চোরেরই ভয়ে। কিন্তু সেটা কবুল করি কী করে? এ চোরও আলাদা ধাতের। কোথায় আমি চোরকে জেরা করব, তা নয় চোরই উল্টে আমার নিকেশ নিচ্ছে। আমি একটু দুর্বল গলায় বলি, কথাটা ঠিক, আপনি পালান না। তার মানে, হয়তো আমার কাকা কাকিমার সঙ্গে আপনার চেনা আছে।

বাব্বাঃ, ভীষণ বুদ্ধি তো আপনার। এতই যদি বুদ্ধি তবে বলুন লুকোলেন কেন?

সেটা বলা শক্ত। হঠাৎ আপনাকে দেখে কেন যেন লুকোতে ইচ্ছে হল।

ফুলচোর হি হি করে হাসে। বলে, সাধে কি লোকে নাম দিয়েছে পাগলা দাশু!

আমি কথাটা শুনি না শুনি না করে পাশ কাটিয়ে বলি, আজ কী চুরি করবেন? দেখুন, বাগানটার দুর্দশা!

আপনার সাজানো বাগান কি শুকিয়ে গেল?- ফুলচোর এখনও হাসছে।

একটা বড় শ্বাস হঠাৎ বেরিয়ে যায় বুক থেকে। জবাব দিই না। কোনও জবাব মাথায় আসছেও না। ফাজিল মেয়েদের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়াটাই বোকামি।

ফুলচোর গলা একটু মাখো মাখো করে বলে, গান শেখা ছেড়েছেন, ফুটবলের মাঠে যান না, সাইকেলেও চড়তে দেখা যায় না আজকাল, আপনার কী হয়েছে বলুন তো!

আমি ফুলচোরের ব্যবহারে খুবই অবাক হয়েছি আজ! তবে কি ফুলচোর আমার প্রেমে পড়েছে। এই ভোরে সেই ভালবাসাই জানাতে এল। আমার মাথার ভিতরে হঠাৎ পশুপতির গলার স্বর প্রম্পট করতে থাকে, বলে ফেলুন! বলে ফেলুন! ভালবাসা একেবারে ছানার মতো ছেড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই বলার নেই আমার। ফুলচোরের বাবাকে আমি টাকা ধার দিইনি। ওর বাবা কে তাই জানি না। পশুপতি ভুল পার্ট প্রম্পট করছে।

আমি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, আজ আপনি ফুল চুরি করতে আসেননি।

তবে কী করতে এসেছি?

আপনার অন্য মতলব আছে।

আছেই তো!

আমার সম্পর্কে এত খবর আপনাকে কে দিল?

খবর জোগাড় করতে হয়।

কেন জোগাড় করতে হচ্ছে?

আমার মতলব আছে যে।

আপনি একটু বেশিরকম ডেসপারেট।

সেটাও সবাই বলে। নতুন কথা কিছু আছে?- ফুলচোর মুখে ভালমানুষি মাখিয়ে বলে।

আছে। আমি গভীর ভাবে বলি, এর আগে আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি।

ফুলচোর হি হি করে হেসে বলে, আমারও তাই মনে হয়,জানেন! মনে হয় যেন, কত কালের চেনা।

আমার গা জ্বলে যায়। বলি, কী বলতে এসেছেন বলুন তো!

রাগ করলেন?

না, সাবধান হচ্ছি। আমার কাকা কাকিমাও আরলি রাইজার। যে কোনও সময়ে এদিকে এসে পড়তে পারেন।

ও বাবা!

বলে ফুলচোর চকিতে একবার চারদিক দেখে নেয়। এখনও যথেষ্ট আলো ফোটেনি। আবছা আলোর মধ্যে এখনও ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গাছপালা, ঘরবাড়ি। ফুলচোর আমার দিকে আবার মুখ ফিরিয়ে বলে, লিচুর সঙ্গে কি আপনার ঝগড়া হয়েছে?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার?

লিচু ভীষণ কাঁদছে যে।

কাঁদছে! কেন কাঁদছে?

তার আমি কী জানি? পাড়ার লোকে বলছে, আপনার সঙ্গে নাকি ওর ভাব ছিল।

মোটেই নয়।

ফুলচোর আচমকা জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ন্যাপথালিন খেলে কি লোকে মরে?

আমি জানি না। কেন?

লিচু ন্যাপথালিন খেয়ে মরার চেষ্টা করেছিল। হাসপাতালে পর্যন্ত নিতে হয়।

উদ্বেগের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করি, বেঁচে আছে তো!

আছে। কিছু হয়নি। বেশি খায়ওনি। হাসপাতালে পেটে নল ঢুকিয়ে সব বের করে দিয়েছে।

মরতে চেয়েছিল কেন?

বোধহয় আপনার জন্য। অবশ্য ভেঙে কিছু বলছে না।

আমি একটু রেগে গিয়ে বলি, এতক্ষণ ইয়ার্কি না করে এই সিরিয়াস খবরটা অনেক আগেই আপনার দেওয়া উচিত ছিল।

আপনার সঙ্গে যে আমার ইয়ার্কিরও একটা সম্পর্ক আছে।

তার মানে?

পালাই, আপনার অত ভয়ের কিছু নেই। লিচু ভাল আছে।

কিন্তু ইয়ার্কির সম্পর্ক না কী যেন বলছিলেন।

না, বলছিলাম যে, আমি ভীষণ ইয়ার্কি করি। বাড়িতে তার জন্য অনেক বকুনিও খাই। বলে ফুলচোর আবার হি হি করে হাসে। তারপর বলে, লিচু কিন্তু খুব কাঁদছে।

তার আমি কী করতে পারি?

আপনি কি ওকে রিফিউজ করেছেন?

রিফিউজের প্রশ্ন ওঠে না। ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আমি একজনকে অলরেডি ভালবাসি!

তাই বলুন। বাব্বা! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

কেন?

আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি লিচুকেই বুঝি বিয়ে করবেন।

বিয়ে অত সস্তা নয়।

আপনার লাভার কি কলকাতার মেয়ে?

হ্যাঁ।

খুব স্মার্ট?

তা জেনে কী হবে?

বলুন না। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

স্মার্ট বটে, তবে আপনার মতো নয়।

দেখতে?

তাও আপনার মতো নয়। রূপটাই কি সব?

সে অবশ্য ঠিক। গায়ের রং কেমন? খুব ফরসা?

না। শ্যামলা। আপনার পাশে দাঁড়ালে কালোই বলবে লোকে।

লম্বা?

লম্বা আপনার মতো নয়। অ্যাভারেজ।

রোগা?

হ্যাঁ, বেশ রোগা।

বোধ হয় পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট?

একদম নয়। তবে গ্র্যাজুয়েট।

বয়স?

আমার প্রায় সমান। আপনার তুলনায় বুড়ি।

বারবার আমার সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন কেন?

খুশি করার জন্য! মেয়েরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দেখতে ভালবাসে।

আচ্ছা, আচ্ছা। এবার বলুন তার নাম কী?

সায়ন্তনী। আপনার নামটা কি তার চেয়ে ভাল?

চালাকি করে নাম জেনে নেবেন, আমি তত বোকা নই।

নামটা বলতে দোষ কী?

চোরেরা নাম বলে না।

না কি অন্য কোনও কারণ আছে?

থাকতে পারে। সকাল হয়ে এল, আমি যাই!

আবার কবে আসছেন?

নিচু হয়ে ঝোপ পেরোতে পেরোতে এবার ফিরে তাকায় ফুলচোর। চাপা স্বরে বলে, এলে খুশি হবেন?

বোধ হয় খারাপ লাগবে না। আজ তো বেশ লাগল।

ফুলচোর হি হি করে হাসে, তাহলে আসব।

বলে ঝোপটা জোর পায়ে পেরিয়ে চলে গেল ফুলচোর। ওকে বলা হল না যে, সব কথা আমি সত্যি বলিনি। কী করে বলব? সায়ন্তনীর চেহারাটা আমার মনে পড়ছে না যে।

৮. কাটুসোনা

কাটুসোনা

আজ দুপুরে হাউহাউ করে হঠাৎ পপির জন্য খানিকটা কাঁদলাম।

দুপুরে এক বারনাচওলাকে ধরে এনেছিল বাঁটুল, দড়ি বাঁধা দুটো বাদর ডুগডুগির তালে নাচল, ডিগবাজি খেল, পরস্পরকে পছন্দ করল, বিয়ে করল। খেলার ফাঁকে ফাঁকে পুটুর পুটুর চেয়ে দেখল ভিড়ের মানুষদের। বসে বসে আমাদের দেওয়া কলা ছাড়িয়ে খেল।

বড় কষ্ট বাঁদরগুলোর। খেলা দেখতে দেখতে অবোলা জীবের কষ্টেযখন বুকে মোচড় দিল একটু তখনই পপির কথাও মনে পড়ে গেল। কাজল-পরানো মায়াবী একজোড়া চোখ ছিল পপির। কী মায়া ছিল ওর দৃষ্টিতে! তাকিয়ে থাকত ঠিক যেন আনজনের মতো। কথাটাই শুধু বলত না, কিন্তু আর সবই বোঝাতে পারত হাবেভাবে। এসব মনে পড়তেই বুকের মোচড় দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। ঘরে গিয়ে কাঁদতে বসলাম।

কাঁদতে যে কী সুখ! কাঁদতে কাঁদতে পপিকে ছেড়ে আরও কত কী ভাবতে ভাবতে আরও কাঁদতে থাকি।

গতবারই কলকাতায় একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল। ভৈরবকাকার সঙ্গে মা আর আমরা ভাইবোনেরা মামাবাড়ি বেড়াতে গেলাম। মার বাপের বাড়ি যাওয়া আর সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে পুজোর বাজার করে আনা, দুই-ই হবে। মামারা কেউ এক জায়গায় থাকে না। তাছাড়া কারওরই বাসা খুব বড় নয়। ফলে আমরা এক এক বাসায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লাম। আমাকে নিয়ে গেল হাতিবাগানের বড়মামা।

বলতে কী মামাবাড়িতে আমাদের বড় একটা যাওয়া হয় না। কলকাতা শহরটা আমাদের কাছে বড় ভয়ের। সে এক সাংঘাতিক ভিড়ে ভরা শহর। মাথা গুলিয়ে দেওয়া ধাঁধার মতো

রাস্তাঘাট। তার ওপর আত্মীয়দের কারও বাড়িতেই হাত পা ছড়িয়ে থাকার মতো জায়গা হয় না! আমরা সেখানে গেলে একা বেরোতে পারি না, রাস্তা পেরোতে বুক ঢিপ ঢিপ করে। ফলে আমরা কলকাতায় কালেভদ্রে যাই। হয়তো নিচার বা পাঁচ বছর পর। ততদিনে কলকাতার আত্মীয়দের সঙ্গে আবার একটু অচেনার পর্দা পড়ে যায়।

বড়মামার মেয়ে মঞ্জু আমার বয়সী, ছেলে শঙ্কু তিন-চার বছরের বড়। সেই বাড়িতে পা দিতে না দিতেই আমি টের পেলাম আমার মামাতো দাদা শঙ্কর মাথা আমি ঘুরিয়ে দিয়েছি। বলতে নেই, ব্যাপারটা আমি উপভোগই করেছিলাম। কাছাকাছি একটা কাঁচা বয়সের ছেলে রয়েছে, অথচ আমাকে দেখে সে হাঁ করে চেয়ে থাকছে না, নিজের কেরানি দেখানোর জন্য নানা বোকা-বোকা কাণ্ড করছে না বা নিজের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে আগডুম বাগড়ম বকছে না–সেটা আমার অহংকারে লাগে।

তবু হয়তো আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। একে তো আমার বিয়ে একজনের সঙ্গে পাকা হয়ে আছে, তার ওপর শঙ্কুদা আমার আপন মামাতো ভাই। কিন্তু বয়সটাই এমন যে, আত্মীয়তার বেড়া বাঁধ মানতে চায় না। যাতায়াত কম বলে আত্মীয়তাটা তেমন জোরালোও হয়ে ওঠেনি। ভাই বোন বলে জানি, কিন্তু সেরকম কিছু একটা দায়িত্ব বোধ করি না। আরও একটা কথা আছে। সেটা হল কিছু কিছু মানুষ বোধ হয় এরকম অসামাজিক, বাঁধভাঙা কাণ্ড করতে বেশি আনন্দ পায়।

লম্বার ওপর শঙ্কুদার চেহারাটা খারাপ নয়। একটু মস্তানের মতো হাবভাব। এ জি বেঙ্গলে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে এবং বিয়ে-টিয়ের কথাও ভাবছে। দ্বিতীয় দিন অফিস থেকে ফিরেই আমাকে বলল, সাত দিনের ছুটি নিলাম। তোকে কলকাতা শহরটা খুব ঘুরিয়ে দেখাব বলে।

আমি মুখেও হাসলাম, মনে মনেও হাসলাম। দুটো অবশ্য দু’রকম হাসি মুখে বললাম, খুব ভাল করেছ। কলকাতাকে যা ভয় আমার। মনে মনে বললাম, সব জানি গো, সব বুঝি!

ছেলে নতুন চাকরিতে ঢুকে ছুটি নেওয়ায় মামা মামি খুশি হননি তা তাদের মুখ দেখেই বুঝলাম। মধু তো মুখের ওপরেই বলল, তোকে দরকার কী? কলকাতা তো কাটুকে আমিই দেখাতে পারি।

কিন্তু শুধু আমিই মাঝে মাঝে টের পাচ্ছিলাম কলকাতা দেখানো না হাতি!

শঙ্কুদ পরদিনই গুচ্ছের ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে আমাকে আর মঞ্জুকে নিয়ে গিয়ে পার্ক স্ট্রিট দেখাল, রেস্টুরেন্টে খাওয়াল, সিনেমায় নিয়ে গেল। মঞ্জু বারবার আমার কানে কানে বলছিল, ইস্! কী পরিমাণ টাকা ওড়াতে দেখেছিস!

শুনে আমার একটু লজ্জা হল। বেচারা শকুদা! এখন তো ওর মাথার ঠিক নেই। পরদিনই বাড়িশুদ্ধ সবাইকে স্টারে থিয়েটার দেখাল। মামি বলল, যাক, কাটুর কল্যাণে শঙ্কুর পয়সায় থিয়েটার দেখা গেল।

এমনি দু’-তিন দিন যাওয়ার পরই বাড়ির লোক কিছু ক্লান্তি বোধ করে ক্ষ্যামা দিল। তখন শঙ্কুদা আমাকে নিয়ে একা বেড়াতে বেরোল। চার দিনের দিন ট্যাকসিতে আমার হাত মুঠোয় নিয়ে বলল, পুজোর আগে কিন্তু ছাড়ছি না। কলকাতার পুজো দেখে যাও এবার।

তুই থেকে তুমিতে প্রোমোশন পেয়ে আমি আবার মুখে আর মনে দু’রকম হাসি হাসলাম। বললাম, যাঃ, তাই হয় নাকি?

কেন হবে না? ইচ্ছে থাকলেই হয়। আমি পিসিকে বলে পারমিশন নেব।

মা আমাকে রেখে যাবেই না।

খুব যাবে।

উঁহু। পুজোর পরেই আমার পরীক্ষা।

পরীক্ষা-টরিক্ষা রাখো তো। পুজোর পর কেন, সারা জীবনই যদি আর যেতে না দিই?

কথাটা বড় সোজাসুজি বলে ফেলে বোধ হয় নিজেই ঘাবড়ে গিয়েছিল শঙ্কুদা। তাড়াতাড়ি বলল, সাবিরের রেজালা খেয়েছ? চলো আজ খাওয়াব।

বাঁধ ভাঙতে আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু তার একটা মাত্রা আছে। দিন পাঁচেকের মধ্যেই বুবলাম, শহুদাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে আমি বিপদ ডেকে এনেছি। ভাড়াটে বাড়ির ছাদে ওঠার এজমালি সিঁড়িতে শম্ভুদা আমাকে সেদিন চুমু খাওয়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। দু' দিনের দিন সকালে ওর ঘোর লাল চোখ দেখে বুঝলাম, সারা রাত ঘুমোয়নি। আমার কথা ভেবেছে।

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল। পুরুষরা জন্মসূত্রেই বোকা, মেয়েরা তো তা নয়। আমি সাবধান হই। মামাকে সেদিনই বললাম, আজ খিদিরপুরে মেজোমামার বাড়িতে যাব। মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মামার মাথায় তো ঘোরপ্যাঁচ নেই। বলল, তা আমার তো অফিস, তোকে বরং শঙ্কু গিয়ে রেখে আসুক। প্রস্তাব শুনে শদা আমার দিকে নিস্পলক অদ্ভুত পাগলা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে যাব। বলেই বেরিয়ে গেল। দুপুরে বেশ দেরিতে ফিরে এসেই বলল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

আমি তৈরিই ছিলাম। ভাত খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। রাস্তায় পা দিয়েই শঙ্কুদা বলল, কাটু, আমাকে বিট্রে করবে না তো? তাহলে কিন্তু মারা যাব।

বলতে নেই, আমি বুদ্ধিমতী। ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, এখন যদি কোনও কড়া কথা বলি তাহলে একদম খেপে যাবে। তাই মুখে হাসি মাখিয়ে বললাম, তুমি এরকম করছ কেন বলো তো! আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি।

আমেরিকার ছেলেটাকে চিঠি লিখে দাও যে, তুমি তাকে বিয়ে করবে না।

আমার বুক তখন ধুকপুক করছে। বললাম, ওরম কোরো না। তোমাকে ভীষণ অন্যরকম দেখাচ্ছে।

পুরুষেরা বোকা বটে, কিন্তু কখনও-সখনও ভারী বিপজ্জনকও। বিশেষ করে প্রেমট্রেমে পড়লে। সেটা বুঝলাম যখন আমাদের ট্যাক্সি খিদিরপুরে না গিয়ে বিচিত্র সব পথে চলতে লাগল।

শঙ্কু পাগলের মতো কখনও আমার হাত চেপে ধরে, কখনও কাঁধে হাত রেখে, কখনও গলা পেচিয়ে ধরে কেবল ভালবাসার কথা বলে যেতে লাগল। সেদিন শঙ্কুদার সব বাঁধ ভেঙে গেছে, কোনও আব্রু নেই, লুকোছাপা নেই, লজ্জা নেই, ভয় ভীতি নেই। বলে, বিশ্বাস করো আমার মা বাবা কিছু মনে করবে না..আমি আলাদা বাসা করব...বিয়ে করেই দ্যাখো, প্রথমে একটু সবাই হয়তো রাগ টাগ করবে, কিন্তু দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে...কলকাতায় এরকম ভাইবোনে কত বিয়ে হয়, এটাই আজকাল ফ্যাশান...আমি আলাদা বাসা নেব, না হয় খুব দুরে বদলি হয়ে চলে যাব...

শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা। মাথা চক্কর দিচ্ছে। লজ্জাও হচ্ছিল খুব।

ট্যাকসিতেই অবশ্য শেষ হয়নি। ট্যাকসিওয়ালা স্পষ্টই সব শুনছে।

আমরা ময়দানে বসলাম, রেস্টুরেন্টেও খেলাম, রাস্তাতেও হটলাম।

বেলা পড়ে এলে বললাম, শঙ্কুদা, এবার আমাকে দিয়ে এসো। আমি না গেলে মা আর ভৈরবকাকা পুজোর বাজার করতে বেরোবে না।

ও! পুজোর বাজার এখন রাখো। তার আগে আমাদের বিয়ের বাজার তো হোক।

শঙ্কুদা সত্যিই নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমাকে একটা দেড়শো টাকার শাড়ি কিনে দিল জোর করে। এত খারাপ লাগছিল কী বলব।

সন্ধে হয়ে এল, তবু শঙ্কদা আমাকে রেখে আসার নাম করে না। বরং বলল, চলো, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এক জায়গায় আমার বন্ধুরা আসবে।

আমি ভয়ে কেঁপে উঠে বললাম, না না।

চলো না। তারপর ঠিক রেখে আসব।

ডাক ছেড়ে তখন আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। শঙ্কুদা যত পাগলামি করছে তত ওর ওপর বিতৃষ্ণা আসছে আমার। পারলে তখন ছুটে পালাই। কিন্তু চারদিকেই তো বিপজ্জনক অচেনা কলকাতা। কোথায় যাব?

ধর্মতলার কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্টে সত্যিই নিয়ে গেল আমাকে শঙ্কুদা। সেখানে পাঁচ-ছ'জন ছোকরা বসে আছে। শঙ্কুদা আমাকে তাদের সামনে হাজির করে বলল, এই আমার ভাবী ওয়াইফ। তারপরই একটু হেসে বলল, ভাবীও নয়। শুধু ওয়াইফ!

আমার কান মুখ ঝা ঝা করছে এখন। রাগে দুঃখে ছিঁড়ে যাচ্ছে বুক। কিন্তু অত লোকের সামনে কী করব? হেসে বরং ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কথাটথাও বলতে হল। বন্ধুগুলো খারাপ নয়! তবে এক-আধজন একটু মোটা ইঙ্গিত করছিল। আমি তাদের মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছি বন্ধুদের কাছে আমাকে নিজের বউ পরিচয় দিয়ে শঙ্কুদা আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। সাক্ষী রাখতে চাইছে। বেঁধে ফেলতে চাইছে।

একবার পালাতে পারলে জীবনে আর কোনওদিন ওর ছায়া মাড়াব না, মনে মনে তখন ঠিক করেছি। তাই দাতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে যাচ্ছিলাম। জানি, আর একটু পরেই মুক্তি পাব।

কিন্তু খুব ভুল ভেবেছিলাম! আমি মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছিলাম। তবু বন্ধুদের সঙ্গে অনেক রাত করে ফেলল শকুদা।

রাত ন' টা নাগাদ বন্ধুদের বিদায় দিয়ে শঙ্কুদা রাস্তায় নেমে বলল, এত রাতে আর কোথায় যাবে কাটু?

আমি চমকে উঠে বলি, তার মানে?

এখন বাস ট্রামের অবস্থা খুব খারাপ! ট্যাকসিও খিদিরপুর যেতে চাইবে না।

তাহলে?

শঙ্কুদা হেসে বললে, আমাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারো, কিন্তু সেটা হয়তো খারাপ দেখাবে।

তুমি কী বলতে চাইছ?

ভয় পেয়ো না কাটু। আমি একটা খুব ভাল পথ ভেবে বের করেছি। আজকের রাতটা আমরা একটা হোটেলে কাটাব।

শুনে আতঙ্কে কেমন হাত পা ছেড়ে দিল আমার। বুক ঠেলে কান্না এল। কোনও বাধা মলিন। সেই কান্না আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম, এব তুমি কী বল?

শঙ্কুদা অনেক সান্ত্বনা দিচ্ছিল, ক্ষমা চাইছিল। বলল, বুঝছ না কেন, কেউ টের পাবে না। রং এত রাতে কোনও বাড়িতে গিয়ে উঠলেই সন্দেহ করবে বেশি। কোনও ভয় নেই।

পুরুষরা যখন পাগল হয় তখন বেকামির মধ্যেও তাদের শয়তানি বুদ্ধি কাজ করে। আমার তখন পাগলের মতো এলোমেলো মাথা। তবু আমি বুঝতে পারলাম, আমি যে ওকে কাটাতে চাইছি তা ও বুঝতে পেরেছে। তাই আমাকে এটো করে রাখতে চায়, যাতে আমি বাধ্য হই মাথা নোয়াতে।

কোথায় সেই হোটেলটা ছিল তা আমি আজও বলতে পারব না। তবে কলকাতার মাঝামাঝি কোথাও। হোটেলটার নামও আমি লক্ষ করিনি। কিছুই লক্ষ করার মতো অবস্থা নয়। তবে মনে হচ্ছিল, আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল সব।

দোতলার একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে তুলল শকুদা। সে ঘরে একটা মাত্র অবল খাটের বিছানা। টেবিলে দুজনের খাবার দিয়ে গেল বেয়ারা, কিছু না বলতেই। শসা আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, ঘাবড়ে যেয়ো না। ওসব কিছুই কেউ জানবে না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো।

বিপদের অনুভূতির প্রথম প্রবল ভাবটা কেটে গেল তখন। বাথরুমে গিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। মাথা বশে এল একটু। বুকে ঢিপিঢিপিনি কমে গেল।

মানুষের মনে কত কী থাকে তার হিসেব নেই। সেই হোটেলের ঘরে আবার যখন কছিলাম তখন খুব খারাপ লাগল না। বরং মনে হল, দোষ কী? কে জানবে? আমার জীবনটা বড় বাধা পথে চলছে। একটু এদিক ওদিক তোক না।

এমনকী আমি তখন ভাতও খেতে পারলাম। হয়তো খাওয়ার পর বিছানাতেও চলে যেতাম কিছু পরে।

কিন্তু শঙ্কুদা যখন দরজার ছিটকিনি তুলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তখন সমস্ত প্রতিটা কেটে গেল।

ছেলেদের মুখে ওরকম কাঙালপনা দেখতে আমার এমন ঘেন্না হয়।

শঙ্কুদা আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে এসে ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল।

কেন নয় কাটু? একটুখানি। একবার। কেউ জানবে না।

তা হয় না। মেয়েরা ও জিনিসটা এত সহজে দিতে পারে না।

প্লিজ কাটু। আজ থেকে তুমি তো আমার স্ত্রী।

আমি চেয়ারে বসে রইলাম বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে, দৃঢ়ভাবে। তারপর সারা রাত চলল অনুনয় বিনয়, পায়ে ধরা, মাথা কোটা, কান্না হাসি। আক্রমণ এবং প্রতিরোধ। একটা রাত যে কত লম্বা হতে পারে তার কোনও ধারণা ছিল না আমার। তবে একটা কথা আমি জানতাম। কোনও মেয়ে যদি ইচ্ছে না করে তবে দশটা পুরুষেরও সাধ্য নেই তাকে রেপ করে। মেয়েদের তেমনই ক্ষমতা প্রকৃতি দিয়ে রেখেছে। মেয়েরা যে ভোগের জিনিস তা কি ভগবানের মতো চালাক লোক জানেন না! ভৈরবকাকাও একবার দারোগা কাকার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে বলেছিল, যে সব মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়, তারা হয় নিজের ইচ্ছেতেই কল মানে, না হলে ভয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

কথাটা ঠিক। শঙ্কুদা রাজি করাতে না পেরে শেষরাতে জোর খাটাতে লাগল। সে এক বীভৎস লড়াই। কিন্তু সে লড়াই শেষ হওয়ার আগেই ভোর হয়ে গেল। আমার গায়ে কয়েকটা আঁচড় কামড়ের দাগ বসে গিয়েছিল শুধু। আর কিছু নয়।

মা আর বড়মামা ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল। যুক্তি করে খুব বুদ্ধির সঙ্গে তারা ঘটনাটা চেপে দেয়। বড়মামি আর মঞ্জুও নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল, কেননা সেই রাতে শঙ্কুদা বাসায় ফেরেনি। কিন্তু কতখানি টের পেয়েছিল তা আমি জানি না! ওদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

অনেকক্ষণ কাঁদলে মনের ভার কমে যায়। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ কেঁদেও কেন যে আমার মনটা তবু ভার হয়ে রইল!

এ শহরের স্কুল কলেজ গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ। আশপাশের নিচু জায়গা বানে ভেসে যাওয়ায় বহু লোক এসে উঠেছে সেখানে। লঙ্গরখানা চালু হয়েছে। বৃষ্টির জন্য সাত দিন বাড়িতে আটকে আছি। বিকেলে রোদ ফুটল। ভাবলাম, যাই লিচুকে দেখে আসি।

লিচু আমাকে দেখে খুশি হল না। গোমড়া মুখ করে রইল।

ওর মা বলল, এসো এসো। বড়লোকের মেয়ে এসেছে আমাদের ঘর আলো করতে।

কথাটায় খোঁচা ছিল কি না কে বলবে! তবে অত ভাববার সময় নেই।

কেমন আছিস?- লিচুকে জিজ্ঞেস করি।

ভাল। খুব ভাল। বেঁচেই আছি মরে যাইনি।

আজ তোকে ভাল দেখাচ্ছে।

ভাল দেখাবে না কেন? ভালই আছি তো।

বাবাঃ। অত মেজাজ করছিস কেন বল তো?

কোথায় মেজাজ! আমাদের মেজাজ বলে কিছু থাকতে আছে নাকি?

কমও তো দেখছি না।

একথাতে হঠাৎ লিচু হ-হুঁ করে কেঁদে উঠল হাঁটুতে মুখ গুঁজে।

ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, কাঁদছিস কেন? আজকাল ওসব ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নাকি?

লিচু জবাব দিল না। অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে কেঁদে তারপর একটু শান্ত হয়ে মুখ তুলল। আস্তে করে বলল, আমি কাঁদছি হারমোনিয়ামটার জন্য।

আবার হারমোনিয়াম? সেটার কী হল?

কর্ণবাবুর টাকা শোধ দেওয়ার জন্য এবার সেটা মা বেচে দিচ্ছে পশুপতিবাবুর কাছে। আমার তবে আর কী থাকল বল?

টাকা শোধ দেওয়ার তাড়া কী? সময় নে না। না হয় আমিই বলে দেবখন কর্ণবাবুকে।

ছিঃ– লিচু জ্বলে উঠে বলে, কক্ষনও নয়। ওঁর কাছে আমরা একদিনও ঋণী থাকতে চাই না।

পাগলা দাশুর ওপর দুই খুব রেগে গেছিস।

ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো তক্ষুনি বাড়ি ফিরে গলায় দড়ি তি। কলকাতার ছেলেরা যে এরকমই হয় তা অবশ্য জানতাম। তোর দেওর, তাই বেশি কিছু বলতে চাই না।

দেওর তো কী?

তুই হয়তো ভাববি, দোষটা আমারই।

মোটেই না। তবে তোর আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল। শুনেছি কর্ণর কলকাতায় একজন লাভার আছে।

আছে।-বলে লিচু চোখ কপালে তুলল, কী শয়তান।

তুই যেটা ধরিস সেটাকেই বড় সিরিয়াস ভাবে ধরিস। আজকাল এসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেউ ভাবে নাকি?

আমি তো তুই নই।

কেন, আমি কীরকম?

তোর সবই মানায়। আমার তো তোর মতো রূপ, গুণ বা টাকা নেই যে একজনকে ছেড়ে দিলেও আর একজন জুটবে। আমাদের সব কিছু হিসেব কষে করতে হয়।

আমি বুঝি প্রায়ই একজনকে ছেড়ে আর একজনকে ধরি?

তা তো বলিনি। বললাম, রূপ গুণ থাকলে ওরকম করা যায়। নিজের গায়ে টানিস না। রাগ করলি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, তোর কথা ভেবেই আমি কর্শর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছি।

কী বলল?

বলল, ওর লাভার খুব স্মার্ট। খুব সুন্দর।

মুখখানা কালো হয়ে গেল লিচুর। বলল, তা হলে তো ভালই, আমাকে কখনও অবশ্য লাভারের কথা বলেনি।

তুই হয়তো জানতে চাসনি। কোনও ছেলের সঙ্গে আলাপ হলে ওটাই প্রথম জেনে নিতে হয়।

জেনে রাখলাম। তুই বুঝি তাই করিস?

নিশ্চয়ই। তবে আমার ইন্টারেস্টটা অ্যাকাডেমিক। তোর তো তা নয়। আবার একজনকে হাতের কাছে পেলেই হয়তো হুড়মুড়িয়ে প্রেমে পড়বি। তাই জানিয়ে দিলাম।

লিচু থমথমে মুখে বলে, আমার জেনে দরকার নেই। যে ছেলেদের মাথা চিবিয়ে বেড়ায় তারই ওটা বেশি জানা দরকার।

আমার মনের মধ্যে তখন থেকে কী যেন একটা খিক খিক করছে। কী যেন একটা মনে পড়ি-পড়ি করছে। পড়ছে না। মনটাও ভীষণ ভার। কিছুতেই কাটাতে পারছি না। তাই কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছে করছিল না। তবু একটু মোলায়েম বিষমেশানো গলায় বললাম, ছেলেরা কাউকে কাউকে মাথা চিবোতে দেয়। সুযোগ পেলে চিবোতে কেউ ছাড়ে না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। উঠব উঠব করছি, এমন সময়ে পাগলা দাশু বাইরে থেকে ডাকল, লিচু।

আমি টুক করে উঠে পড়লাম।

ডাক শুনে লিচু এত চমকে উঠে, শিহরিত হয়ে, শুস্তিত মুখে বসে রইল যে আমার সরে পড়াটা লক্ষই করল না। ওর মুখে ভয়, চোখে অবিশ্বাস, মুখে স্বপ্নের আস্তরণ। বেচারা।

আমি উঠোনের দরজা দিয়ে পালিয়ে আসার সময় একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম। কর্ণর চেহারাটা সত্যিই বেশ। লম্বা চওড়া, পুরুষোচিত। কিন্তু সাজগোজ অত্যন্ত ক্যাবলার মতো। মুখে অন্যমনস্কতা। হঠাৎ মনের মধ্যে টিকটিকিটা খুব জোর ডেকে উঠল। এমনকী দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। পায়ের নীচে মাটিও কেঁপে গেল যেন। আশ্চর্য। কর্ণ মল্লিককে যে আমিও আগে কোথায় দেখেছি।

৯. পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

একদিনই মাত্র রোদ উঠেছিল কিছুক্ষণ। তারপর আবার ঘনঘোর মেঘ করে এল। গরাদের মতো বৃষ্টি ঘিরে ধরল আমাদের। এই যেন পৃথিবীর শেষ বৃষ্টিপাত। এত তেজ সেই বৃষ্টির যে মাটিতে পড়ে তিন হাত লাফিয়ে ওঠে জলের ছাট। বুঝি বা ফুটো করে দেয় মাটি। আমার ভয় হয়, বৃষ্টি থামলে বুঝি দেখব গোটা শহরটাই একটা চালুনির মতো অজস্র ছ্যাদায় ভরে আছে।

প্রথম বর্ষায় কিছু জায়গা ডুবেছিল। এই দ্বিতীয় বর্ষায় পাহাড়ি ঢল নেমে ভেসে যেতে লাগল গাঁ গঞ্জ। শহরের আশেপাশে নিচু জায়গায় জল ঢুকছে। ট্রেন বন্ধ, সড়ক বন্ধ, এরোপ্লেন উড়ছে না।

কখনও আমি লঙ্গরখানায় ধুন্ধুমার জ্বলন্ত উনুনে জাহাজের মতো বিশাল কড়াইয়ে খিচুড়িতে হান্ডা মারছি। ঘামে চুকচুবে শরীর। কখনও দলবল নিয়ে বাজার ঢুড়ে ব্যাবসাদারদের গদি থেকে চাল ডাল তুলে আনছি। কখনও পার্কে ময়দানে বাঁশ পুঁতে খাড়া করছি ক্রিপলের আশ্রয় শিবির। প্রতিদিন শহরের বাইরে ভেসে-যাওয়া গাঁ গঞ্জ থেকে যে হাজার হাজার লোক আসছে তাদের মাথা গুনতি করে বেড়াচ্ছি। মিলিটারির এক বাঙালি ক্যাপটেনের সঙ্গে ভাব করে ডিফেন্সের নৌকোয় চলে যাচ্ছি তোক উদ্ধার করতে। আমি কোথায় তা কাকা কাকিমা টের পায় না, এমনকী অফিস টের পায় না, আমি নিজে পর্যন্ত টের পাইনা। কখন খাচ্ছি, কখন ঘুমোচ্ছি তার কোনও ঠিক ঠিকানা জানি না। মাঝে মাঝে টের পাচ্ছি গায়ের ভেজা জামাকাপড় গায়েই শুকিয়ে যাচ্ছে। চিমসে গন্ধ বেরোচ্ছে শরীর থেকে। দাড়ি যৌবনের রবি ঠাকুরকে ধরে ফেলেছে প্রায়। চুলে জট। গায়ে আঙুল দিয়ে একটু ঘষলেই পুরু মাটির স্তর উঠে আসে। গায়ে গায়ে অনেক ক্ষত ওষুধের অভাবে, এমনিই শুকিয়ে আসছে। আমবাড়িতে একবার জলের তোড়ে নৌকো

উল্টে ভেসে গেলাম। ফাঁসিদেওয়ায় অল্পের জন্য সাপের ছোবল থেকে বেঁচে যাই। ডামাডোলে আমার ঘড়িটা হারিয়ে গেছে, জুতোজোড়া ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় ফেলে দিয়েছি, শার্টটা বদান্যতাবশে এক রিফিউজিকে দিয়ে দিলাম। এখন আছে শুধু গেঞ্জি ছেঁড়া প্যান্ট, আর আছি আমি। গুরুং বস্তির অন্তত শ দুয়েক লোক নিখোঁজ। মাইল পাঁচেক দূরে খরস্রোতা নদী বেয়ে গিয়ে গাছ থেকে আমরা জনা দশেক আধমরা মানুষকে উদ্ধার করলাম। তিস্তার জলের তোড়ে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়া এক দুর্গম শহরে ঢুকে লাশ আর জিয়ন্ত মানুষ বাছতে হিমশিম খেতে হল। আমি কী করে এখনও বেঁচে আছি, তাই আশ্চর্য লাগে খুব।

কলকাতাতেও বৃষ্টি পড়ছে কি? কীরকম হয়েছে এখন কলকাতার অবস্থা? চোখ বুজে ভাবতে গিয়ে দেখি, গোটা কলকাতাকেই উপড়ে নিয়ে কে যেন একটা উঁচু পাহাড়ের ঢালে যত্ন করে সাজিয়েছে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাচ্চাদের জন্য মস্ত লোহার ড্রামে খাবলে খাবলে গরম জলে গুঁড়ো দুধ গুলতে গুলতে আমি একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কলকাতাকে নিয়ে ভাবার এর পর কোনও মানেই হয় না। সময়ও নেই। রিলিফের কাজ করতে করতে কখন যে সবাই আমার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে কে জানে। চেনা অচেনা, ছেলে বুড়ো অফিসার পাবলিক হাজারটা লোক মুহুর্মুহু এসে এ কাজে সে কাজে পরামর্শ চাইছে। কর্ণদা, কর্ণবাবু, কর্ণ ভায়া, মল্লিক মশাই, মিস্টার মল্লিক, মল্লিক শুনতে শুনতে কান ঝালপালা। সব কাজই আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু একটা আমি যেন দশটা হয়ে উঠি। এবং দশ থেকে ক্রমে এগারোটা, বারোটা ছাড়িয়ে একশোর দিকে এগোই।

কে যেন এসে খবর দিল, কর্ণদা, আপনার অফিসের পিয়োন আপনাকে খুঁজতে এসেছে।

অফিস! আমি লজ্জায় জিব কাটি। এতদিনে অফিসের কথা একদম খেয়াল ছিল না। পিয়োন আমাকে দেখে চোখ কপালে তোলে, আপনিই কি আমাদের জুনিয়ার অফিসার কর্ণ মল্লিক? একদম পাল্টে গেছেন স্যার!

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করলাম মাত্র। পিয়োন আমাকে একটা চিঠি ধরিয়ে দিয়ে গেল। আজ ফ্লাড সিচুয়েশন নিয়ে অফিসারদের জরুরি মিটিং। বেলা বারোটায়।

আজকাল কোথাও বসে একটু বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলেই আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাই, সেই ভয়ে এক মুহূর্তও আমি বসি না। কিন্তু জেলা অফিসারের ঘরের মিটিং-এ গদি আঁটা চেয়ারে বসে ফ্লাড সিচুয়েশন সম্পর্কের কথা শুনতে শুনতে বার বার আমার চোখ চুম্বকের মতো সেঁটে যাচ্ছিল. জেলা অফিসারপ্রথমেআমাকে চিনতে পারেননি। তারপর বলেছেন, ইউ লুক ভেরি সিক। তারপর নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলেছেন, ইউ স্টিক।

সবই সত্য। তবে আমার কীইবা করার আছে?

মিটিংএর শুরুতেই জেলা অফিসার বললেন, ফ্লাডের যা অবস্থা তাতে আমাদের ইমিডিয়েটলি রিলিফ ওয়ার্ক করতে হবে। আপনারা এক একজন এক একটা রিলিফ ওয়ার্কের চার্জ নেবেন। সরকারি অর্ডার, অফিসারকেই রিলিফ ওয়ার্কে নামতে হবে।

আমি হাই তোলায় জেলা অফিসার আমার দিকে কঠিন চোখে একবার তাকালেন। বললেন, ডোন্ট ইউ অ্যাগ্রি?

ইয়েস স্যার।

আমি ওপর নীচে মাথা নাড়লাম। বাড়ি যাওয়ার সময় পাইনি। ক্যাম্প থেকে একজন ভলান্টিয়ারের আধময়লা জমা চেয়ে পরে এসেছি। একজোড়া হাওয়াই চটি ধার দিয়েছে আর একজন। আমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত অফিসারের মতো দেখাচ্ছে না!

জেলা অফিসার সবাইকে কাজ ভাগ করে দিচ্ছিলেন। আমি অতি কষ্টে বার বার ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও জেগে থাকার চেষ্টা করছি।

মিস্টার মল্লিক।

ইয়েস স্যার।

আপনি কীসের চার্জ নেবেন?

আমি ঘুমকাতর গলায় বলি, আমি জীবনে কখনও রিলিফ ওয়ার্ক করিনি। আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

হিমশীতল গলায় জেলা অফিসার বললেন, কথাটা সত্যি নয় মল্লিক। আপনি গত কয়েকদিন অফিসের কাজ ফেলে রেখে বিস্তর রিলিফের কাজ করছেন। কিন্তু তার একটাও সরকারি নীতিবিধি মেনে করেননি। একজন সরকারি অফিসারের দায়িত্ব যা হতে পারে তার একটাও পালন করেননি।

ক্রমে তার গলা এন্টু একটু করে উঁচুতে উঠতে থাকে, উইদাউট ইকুইপড উইথ প্রপার ক্রেডেনসিয়ালস আজ এ পবলিক সারভেন্ট আপনি ডিফেনএর রিলিফ টিমের সঙ্গে বহু জায়গায় গেছেন এবং সেটাও গেছেন উইদাউট প্রায়র অ্যাপকভ্যাল। আপনি সরকারি গোডাউন থেকে সমস্ত প্রোটোকলঅগ্রাহ্য করে ফুডগ্রেন বের করে দিয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কমপ্লেন করেছেন, আপনি গাখী ময়দানে তাবু খাটাতে গিয়ে ত্রিপলের এক কোনার দড়ি গাঁধীর স্ট্যাচুর গলায় বেঁধেছিলেন। দেয়ার ইজ এ ভেরি সিরিয়াস চার্জ এগেনস্ট ইউ। আমার প্রশ্ন, এগুলো আপনি কেন করেছেন? পবলিকের চোখে হিরো হওয়ার জন্য?

আমি অতল ঘুম থেকে নিজেকে টেনে তুলে বলি, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি স্যার।

আপনি যখন রাইটার্স বিল্ডিংসেছিলেন তখনও এই ধরনের কিছু কিছু কাজ করেছেন। আপনার সি আর-এ তার উল্লেখ আছে। স্বয়ং মিনিস্টারও আপনার ওপর খুশি নন। গত ইলেকশনে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে আপনি একটা বুখ সিল হয়ে যাওয়ার পরও রিওপেন করেছিলেন। ব্যালটের বদলে লোককে নিজে সই করে সাদা কাগজ দিয়েছিলেন ব্যালট হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আপনি পরে রিপোর্টে বলেছিলে, ওই বুথ ওপেন করার

আগেই সব ভোট জমা পড়ে যাওয়ায় আপনি ওই কাণ্ড করেন। সেটা হতে পারে। কিন্তু কেউ কারচুপি করে যদি বুথ দখল করেই থাকে তার জন্য প্রপার প্রসিডিওর আছে। সাদা কাগজকে ব্যালট হিসেবে ব্যবহার করার নজির আপনিই প্রথম সৃষ্টি করেছেন। সেখানেও পাবলিক আপনাকে ম্যানহ্যান্ডেল করায় আপনাকে প্রায় মাসখানেক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। উই নো এভরিথিং অ্যাবাউট ইউ।

এ সবই সত্য। আমার কিছু বলার থাকে না আর। বসে বসে আমি এক বিকট চেহারার ঘুমরাক্ষসের সঙ্গে আমার দুর্বল লড়াই চালাতে থাকি।

জেলা অফিসার হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি পাগল?

না, স্যার। আমি দুর্বল গলায় বলি!

আপনার মেডিক্যাল রিপোর্টও খুব ফেবারেবল নয় মিস্টার মল্লিক। হাসপাতালের ডাক্তারদের অভিমত হল, সেই বুথ নিয়ে গণ্ডগোলের সময় আপনার ব্রেন ড্যামেজ হয়েছিল। যাকগে, এইসব নানা কারণেই আপনাকে নর্থ বেঙ্গলে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বোধ হয় আপনিও সেটা জানেন।

আমি চকিতে ঘুমিয়ে কয়েক সেকেন্ড একটা স্বপ্ন দেখে ফেলি। দেখতে পাই, ফুলচোরের সঙ্গে আমি একটা জাহাজের ডেক-এ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি। চোখ খুলে আমি বলি, কিন্তু তার পরেও আমি সরকারি কাজে আরও কয়েকবার পাবলিকের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়েছি স্যার। তবে আমার ধারণা প্রত্যেকবারই আমাকে পিটিয়েছিল হয় কোনও পলিটিক্যাল পার্টির লোক, নয়তো সাদা পোশাকের পুলিশ। পাবলিক নয়। এনিওয়ে আমার ব্রেন ড্যামেজের কথাটা আমি অস্বীকার করছি না।

জেলা অফিসার ঘড়ি দেখছিলেন। বললেন, পুরো এক মিনিট পর আপনি আমার কথার জবাব দিলেন। যাকগে, ইউ আর টায়ার্ড, আই নো। আপনাকে রিলিফ ওয়ার্ক থেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।

আমি উঠতে যাচ্ছিলাম।

জেলা অফিসার বললেন, শুনুন। আপনি ফ্লাডে এখানে যা করেছেন তার জন্য সরকারিভাবে আপনি হিরো তো ননই, বরং ইউ আর এ সিরিয়াস ডিফলটার! তাই সরকারিভাবে আমি আপনাকে ধন্যবাদও দিচ্ছি না। কিন্তু

কিন্তু?– আমি অবসন্নভাবে চেয়ে থাকি।

জেলা অফিসারের থমথমে মুখে হঠাৎ হাসির বজ্রপাত হল। হো হো হো করে হেসে বললেন, কিন্তু বেসরকারিভাবে আই র‍্যাদার লাইক ইউ।

ফিরে এসে আমি আবার লঙ্গরখানায় খিচুড়ি হাড়িতে হাত মারতে থাকি। জীবনে আমার আর কী করার আছে বা ছিল তা আমার ঘুমে আর ক্লান্তিতে ডোম্বল হয়ে যাওয়া মাথায় কিছুতেই খেলে না। ভাবছি নিজের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টটা চুরি করে একবার দেখতে হবে। কলকাতায় আমি আর কী কী কাণ্ড করেছিলাম তা জানা দরকার। জানলে যদি আবার কলকাতার কথা আমার মনে পড়ে।

কে একজন এসে জরুরি গলায় বলল, কর্ণবাবু! আপনার কাকা।

ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই কাকা এসে আমার হাত থেকে হাভা কেড়ে নিয়ে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার বাড়ি চল, চল শিগগির।

বাড়ি ফিরে কী করেছি তা মনে নেই। এক মাতালের মতো গভীর ঘুমের কুয়ো আমাকে টেনে নিয়েছিল।

কদিন পর ঘুম থেকে উঠলাম তা বলতে পারব না, কিন্তু যখন উঠলাম তখন আমার সারা গায়ে এক হাজার রকমের ব্যথা। হাড়ের জোড়ে জোড়ে খিল ধরে আছে, কান ভোঁ ভোঁ

করছে। একজন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করছেন। কাকা চেয়ারে এবং কাকিমা আমার বিছানায় গম্ভীর মুখে বসা।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার কী হয়েছে?

ডাক্তার চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বললেন, তেমন কিছু তো দেখছি না।

কাকা গম্ভীর গলায় বললেন, খুবই আশ্চর্যের কথা। আমার তো মনে হয়েছিল, ও আর বাঁচবেই না। চেহারাটা দেখুন, চেনা যায় ওকে? গাড়লটাকে সবাই মিলে খাঁটিয়েই প্রায় মেরে ফেলেছিল। আমি যখন গিয়ে ওকে ধরে আনলাম তখন ওর কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

কাকিমা কথা বলছেন না তবে আমার গায়ে হাত রেখে বসে আছেন চুপচাপ।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, একজন, একসট্রিম একজন। ফুল রেস্টে রাখবেন।

আমি দেখতে দেখতে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। আমার সময়ের কোনও জ্ঞান থাকে না। ঘুম ও জাগরণের মধ্যে পার্থক্যও লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।

শুনছেন?

বলুন।

আপনি কেমন আছেন?

ভাল।

আপনাকে দেখতে এলাম।

আপনি কি ভোরের পাখি? ভোর ছাড়া আসেন না তো।

আমি ফুলচোর। আমার এইটেই সময়।

আমি জানি আপনি আজকাল ফুল চুরি করতে আসেন না।

আপনার বাগানে যে ফুলই নেই। শুধু কাদা আর জল।

ফুল যখন নেই তখন কেন এলেন?

বললাম যে! আপনাকে দেখতে।

আমার কি কোনও অসুখ করেছে?

সে তো আপনারই ভাল জানার কথা। লোকে বলছে আপনি বন্যার সময় খুব খেটেছেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালার দিকে চেয়ে থাকি। জানালার বাইরে কাকভোরের আবছা অন্ধকারে ফুলচোর দাঁড়িয়ে। আজ গলায় কোনও ইয়ার্কির ভাব নেই।

আমি বিছানায় উঠে বসি। বলি, সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমার অসুখ অন্য।

সেটা কী?

যে শহরে আমি জন্মেছি, বড় হয়েছি, কিছুতেই তার কথা মনে পড়ছে না। কী যে যন্ত্রণা।

জানি। লিচুও আমাকে এরকম একটা কথা বলছিল। আপনার নাকি সায়ন্তনীর কথাও মনে পড়ছে না।

না। কী করি বলুন তো!

ফুলচোর এবার একটু ফাজিল স্বরে বলল, সিনেমায় এরকম ঘটনা কত ঘটে! অ্যাকসিডেন্টে স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়। ফের আর একটা অ্যাকসিডেন্টে স্মৃতি ফিরে আসে। ব্যাপারটা খুবই রোমান্টিক। ভয় পাচ্ছেন কেন?

আমি মাথা নেড়ে বলি, এটা স্মৃতিভ্রংশ নয়।

তবে কী?

মানুষ কিছু জিনিস ভুলতে চায় বলেই ভুলে যায়। কিন্তু আমি কেন কলকাতার কথা ভুলতে চাইছি?

ভুললেন আর কোথায়?- ফুলচোর অন্ধকারেই একটু শব্দ করে হাসে, সেদিন তো নিজের ভালবাসার মহিলাটির কথা অনেক বললেন।

আমি অন্ধকারেই বসে বসে আপনমনে মাথা নাড়ি। বলি, কবে যেন, আজ না কাল, স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি একটা লুপ্ত শহর আর একটা লাশ খুঁজতে বেরিয়েছি। দেখি, যেখানে কলকাতা ছিল, সেখানে মস্ত নিলা মাঠ। একটা টিনের পাতে আলকাতরা দিয়ে কে লিখে রেখেছে, হিয়ার লাইজ ক্যালকাটা।

লাশটা কার?

বোধ হয় সায়ন্তনীর।

যাঃ।

আমি বললাম, সেই জন্যই আমি কিছুদিন কলকাতা থেকে ঘুরে আসতে চাই।

ফুলচোর চুপ করে রইল। বহুক্ষণ বাদে বলল, যাবেন কী করে? এখনও ট্রেন চলছে না যে।

প্লেন চলছে। আমাকে যেতেই হবে।

আপনার শরীর তো এখনও দুর্বল।

আপনি আমাকে নিয়ে খুব ভানে তো।

কোনও জবাব এল না।

আধো ঘুমে, আধো জাগরণে আমি টের পাই, ফুলচোর এসেছিল। চলে গেছে।

১০. কাটুসোনা

কাটুসোনা

আমার সর্বনাশ চৌকাঠের ওপাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে ঘরে ঢুকবে। বুকের মধ্যে অলক্ষনে টিকটিকি ডাকছে সব সময় টিক টিক টিক টিক।

আমার জন্ম এই শহরে। আমি এখানে রাজহাঁসের মতো অহংকারে মাথা উঁচু করে হাঁটি। রাজ্যের মেয়ে আমাকে হিংসে করে। আমার বড় সুখের বাঁধানো জীবন ছিল। সেই সব কিছু লন্ডভন্ড করতে কেন এল পাগলা দাশু?

শঙ্কুদার রেস্টুরেন্টের বন্ধুদের কারও মুখই আমি ভাল করে দেখিনি। এতদিনে কারও মুখই মনে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য, এই একটা মুখ কী করে যেন খুব অস্পষ্ট জলছাপের মতো থেকে গিয়েছিল মনের মধ্যে। লিচুদের বাড়িতে সেদিন পাগলা দাশু গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে না গেলে হয়তোবা কোনওদিনই মনে পড়ত না।

অমিতের সঙ্গে বিয়ে না হলেও আমার তেমন কিছু যাবে আসবে না, ওর সঙ্গে তো আমার ভাব ভালবাসা ছিল না। শুধু জানি লোকটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। মনটাকে সেইভাবে তৈরি রেখেছি। কিন্তু সেই মন ভেঙে আবার গড়ে নিতে কষ্ট হবে না তেমন, যেটা সবচেয়ে ভয়ের কথা তা হল শঙ্কুদার সঙ্গে আমার সেই ঘনিষ্ঠতা যা আজ পর্যন্ত খুব কম লোক জানে। বলতে গেলে দু'জন, মা আর বড়মামা।

বহুদিন বাদে শঙ্কুদার সুঙ্গে সেই ঘটনাটার গা ঘিনঘিনে স্মৃতি,   তার লজ্জা তার ভয় নিয়ে ফিরে এল পরিষ্কার মনে পড়ছে টেবিলের বাঁ ধারে মুখোমুখি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল পাগলা দাশু। কথা বলছিল খুব কম। তবে মাঝে-মাঝে খুব বড় বড় চোখে চেয়ে দেখছিল আমাকে। যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা।

আর কিছু মনে নেই। শুধু ওইটুকু। পাগলা দাশুরও তেমন করে মনে রাখার কথা নয় আমাকে, কিন্তু তবু কী করে যেন মনে রেখেছে ও। একটু আলোছায়া রয়েছে এখনও, কিন্তু একদিন হঠাৎ মনে পড়বে হয়তো, তক্ষুনি লাফিয়ে উঠবে। বলবে, আরে! সেই মেয়েটা না?

কী লজ্জা!

বড় বেশি পাগল হয়েছিল শঙ্কুদা। রাত্রে হোটেলের ঘরে যখন আমাদের মরণপণ লড়াই চলছে। তখন একবার পাগলের মতো হেসে উঠেছিল, আমার বরা জানে যে তুমি আজ আমার সঙ্গে হোটলে রাত কাটাবে। এই হোটেলের মালিকও ওদেরই একজন। সব জানাজানি হয়ে গেছে কাটু। এখন পিছিয়ে গিয়ে লাভ নেই।

সেই কথাটা এত দিন গুরুতর হয়ে দেখা দেয়নি, আজ বিষ বিছের হল হয়ে ফিরে এল। তার মানে পাগলা দাশুও সব জানে। জানে, কিন্তু মনে পড়ছে। যতক্ষণ মনে পড়ে ততক্ষণসাশ চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

ইদানীং আমাদের সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে রক্তকরবীর নন্দিনী আর রাজার মতো। আমি খুব ভোরে উঠে পড়ি। রাতে ঘুমই হয় না। সারা রাত বুকে টিকটিকির ডাক! ঘুমাই কী করে?

প্রায়ই সন্তর্পণে গিয়ে মল্লিকবাড়ির জানলার ধারে দাঁড়াই।

শুনছেন?

পাগলা দাশুও জেগে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে জানলার ধারে, মুখে বিষ হাসি, বলে, ফুলচোর!

ও হয়তো ভাবে, আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। ভাবুক, যা খুশি ভাবুক, শুধু যেন মনে না পড়ে আমাকে। আমি ওর মাথা আরও গুলিয়ে দেব। মেয়েরা তো পারে ওই সব। আমি কিছু বেশিই পারি।

একদিন মৃদু মোলায়েম স্বরে বলে ফেলি, চুরি করতে নয়, আমি আজকাল ধরা দিতে আসি।

ঠাট্টা করছেন?

কেন, আমি সব সময়ে কি শুধু ঠাট্টাই করি? আমার মন বলে কিছু নেই?

ফাজিল মেয়েরা কতভাবে পুরুষকে নাচায়।

আপনি আর নাচছেন কই?

আমার কথা আলাদা। আমি আর স্বাভাবিক নই। কিছু মনে পড়ছে না। যতদিন না সব ঠিকঠাক মনে পড়ে, ততদিন আমি আর স্বাভাবিক নই।

মনে করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। খামোকা চেষ্টা করছে কেন? ওতে মাথা আরও গুলিয়ে যায়।

পাগলা দাশু ইদানিং বড় অস্থির, দু হাতে মাথার চুল খামচে বড় বড় আনমনা চোখে দূরের অন্ধকার পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকে। বলে, মানুষ আসলে কিছুই ভোলে না, সব তার মস্তিষ্কের কোষে সাজানো থাকে থরে থরে। কিন্তু সব কথা সে মনে রাখতে চায় না। কিছু ঘটনাকে সে বাতিল করে দেয়, ভুলতে চায়। তাই ভুলে যায়। কিন্তু আমি কেন ভুলতে চাইছি?

আমি কথাটা ঘুরিয়ে দিই। জিজ্ঞেস করি, আপনি কলকাতায় কবে কেন?

শিগগিরই যাব। অফিস ছুটি দিতে চাইছে না। যেদিন দেবে সেদিনই রওনা হব।

সায়ন্তনী আপনাকে চিঠি দেয় না?

দেয়। খুব ভাল চিঠি লেখে সায়ন্তনী।

আপনাদের বিয়ে কবে?

আসছে শীতে।

আমি করুণ মুখ করে বলি, আপনি কলকাতায় গেলে এই জানলাটা আমার কাছে একদম ফাঁকা লাগবে ক'দিন।

পাগলা দাশু হাসে। বলে, চিরকালের জন্যও ফাঁকা লাগতে পারে, আমি কলকাতায় লি চেয়ে দরখাস্ত করেছি।

শুনে আমার মনে খুশির জোয়ার এল। জানলার গ্রিল প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরে প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেলি, কবে?

পাগলা দাশু একটু যেন অবাক হয় আমার উৎসাহ দ্যাখে, বলে কে জানে! হয়তো হবেই না, ইনএফিসিয়েন্সি আর ডিসওবিডিয়েন্স-এর জন্য আমাকে কলকাতা থেকে ট্রানসফার করা হয়েছিল, ওরা আমাকে হয়তো ফেরত নেবেনা।

আমি নিভে যাই। বলি, ও

খুশি হলেন না তো!

আমি আবার কথা ঘোরানোর জন্য বলি, সায়ন্তনী আনাকে চিঠিতে কী লেখে?

কী আর লিখবে? আমরা প্রায় ছেলেবেলা থেকে দুজনে দুজনকে ভালবাসি। তাই দু'জনের মধ্যে নতুন কথা তো কিছু নেই। আমাকে ও ভাল থাকতে লেখে, সাবধানে চলতে বলে, মন দিয়ে চাকরি করতে কম দেয়, ঠিক প্রেমের চিঠি নয়। কিন্তু ভাল চিঠি।

সায়নী আপনাকে কখনও সন্দেহ করে না?

না, কেন করবে?আমি তো অবিশ্বাসের কিছু করিনি!-বলেই হঠাৎ থমকে যায় পাগলা দাশু। সঙ্গে সঙ্গে বলে, না, করেছি, নিশ্চয়ই করেছি। নইলে আমি ভুলতে চাইছি কেন?

আমিও অনেক কিছু ভুলে যেতে চাই। আপনার মতো যদি ভুলতে পারতাম।

কী ভুলতে চান আপনি?

ধরুন এই জানলাটা, এই বাগান, এই কয়েকটা ভোরবেলার কথা। সবচেয়ে বেশি ভুলতে চাই আপনাকে।

ফাজিল।-বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয় পাগলা দাশু।

আমি গভীর স্বরে বলি, সত্যি। বিশ্বাস ফুলচোর, এটা ইয়ারকির কথা নয়। আমার সমস্যা অনেক জটিল।

আমি অভিমান করে বলি, লিচুর জন্য আপনার যে দরদ সেটুকুও কি আমার জন্য নেই?

পাগলা দাশু কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে যায়, হাঁ করে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে। তারপর একটু হেসে বলে, লিচু আপনার মতো ফাজিল নয়।

আমি অভিমানের সুরটা বজায় রেখে বলি, এ বাগানে সাপ আছে পোকামাকড় আছে। এই অন্ধকার ভোরে সাপখোপের ভয়কে তুচ্ছ করে শুধু ফাজলামির জন্য কেউ আসে?

ইচ্ছে হয় বলি, রাধা কি কৃষ্ণের কাছে ফাজলামি করতে যেত? কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে, আর পাগলা দাশু সেটাকে আরও ফাজলামি ভাববে বলে চেপে যাই।

পাগলা দাশু সাপের কথায় ভয় পেয়ে বলল, একটা টর্চ নিয়ে আসতে পারেন না!

ও বাবা! 'তা হলে দরদও তো আছে দেখছি।

আছে। বোধ হয় আছে। কিন্তু আমি জানি আপনি অভিসারে মোটেই আসেন না ফুলচোর, আপনার অন্য কোনও মতলব আছে।

কী করে বুঝলেন?

আপনার মুখ অনেক কথা বলে, চোখ বলে না, আপনি আমাকে জ্বালাতে আসেন। আজও তাই আমাকে আপনার নামটাও বলেননি।

আমার নাম কৃষ্ণা।

হতে পারে। নাও হতে পারে।

বিশ্বাস হয় না আমাকে?

না। কী করে বোঝাই বলুন তো!

এ সব বোঝাতে হয় না ফুলচোর। আপনা থেকেই বোঝা যায়।

ভোর হয়ে আসে। আমি পালিয়ে আসি।

খেলাটা খুবই বিপজ্জনক, এই মফসসল শহরে একবার যদি পাগলা দাশুর সঙ্গে আমার জানালার আড্ডার কথা লোকে জেনে যায় তবে সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে যাবে। এ তো কলকাতা নয় যে, কারও খবর কেউ রাখে না। তবু আমি বুকিটা নিই বড় আর এক সনাশ ঠেকাতে।

মা একদিন জিজ্ঞেসই করল, সকালে আজকাল গলা সাধতে বসিস না?

ইচ্ছে করে না।

কত দামি হারমোনিয়ামটা কোলি, কালীবাবু গুচ্ছের টাকা নিচ্ছেন, বলচিকে দিতে হচ্ছে। এ তোর কেমন উড়নচণ্ডী স্বভাব?

ভাল লাগে না, কী করব?

তা হলে রোজ ভোরবেলায় উঠে করিস কী?

মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই।

মা মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলে না।

আমি আবার একদিন পাগলা দাশুর জানলায় হানা দিয়ে বলি, আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন?

গ্রে স্ট্রিট।

সেটা কোথায়?

উত্তর কলকাতায়। কেন, গ্রে স্ট্রিট চেনেন না? বিখ্যাত জায়গা।

আমি এবার সন্তর্পণে একটা টোপ ফেলি। বলি, আমি কখনও কলকাতায় যাইনি।

যাননি!-বলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে লোকটা। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বলে, তা হলে আগে আমি আপনাকে কোথায় দেখেছি? কলকাতায় নয়? তবে কোথায়?

আপনি আমাকে আগে কখনও দ্যাখেননি।

পাগলা দাশু মাথা নাড়ে, দেখেছি। ভীষণ চেনা মুখ। ভেবেছিলাম কলকাতায় গেলেই আপনাকে আমার ঠিক মনে পড়ে যাবে। তা নয় তা হলে?

না। আমি কলকাতায় যাইনি। যেতে খুব ইচ্ছে করে। বলতে বলতেও টের পাই, আমার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঢিবঢিব করছে। কলকাতায় গেলে মনে পড়বে? তা হলে আমার সর্বনাশ যে চৌকাঠ ডিঙোবে!

পাগলা দাশু বলে, কখনও কলকাতায় যাননি? সত্যি?

না। আমি গম্ভীর মুখে বলি, আপনি কবে যাচ্ছেন?

ছুটি পেলেই।

পাননি এখনও?

না, দিচ্ছে না। বন্যার সময় আমি বিনা নোটিসে কামাই করায় খুব গণ্ডগোল চলছে।

তা হলে?

যেতে পারছি না। কিন্তু যাওয়াটা দরকার।

.

একদিন দুপুরে ম্লানমুখী লিচু এসে বলল, আমাদের হারমোনিয়ামটা আজ পশুপতিবাবু নিয়ে গেল। মাত্র পঁচাত্তর টাকায়।

বলেই আমার নির্জন ঘরের বিছানায় বসে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

বড় কষ্ট হল বুকের মধ্যে। পুরনো ভাঙা একটা হারমোনিয়াম নিয়েই ওর কত সাধ আহ্লাদ!

পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, কাঁদছিস কেন? আমার নতুন স্কেল চেঞ্জারটা পড়েই থাকে। তুই যখন খুশি এসে গান গাস।

একটু কেঁদে ও চোখ মুছে বলল, সে কি হয়?

কেন হয় না? এ বাড়িতে তোর কোন ভাসুর থাকে?

তা নয় রে! নিজের হাতের কাছে একটা জিনিস থাকা, ভাঙা হোক, পুরনো হোক, সেটা তবু আমাদের নিজস্ব ছিল।

মাসিমাই বা কেন হারমোনিয়ামটা বিক্রি করেই ছাড়লেন? এটা অন্যায়। আমি রাগ করে বলি।

লিচু বলে, কর্ণবাবু হারমোনিয়ামটা কেনায় আমাদের বদনাম হয়েছিল। সেই থেকে ওটার ওপর মায়ের রাগ। তা ছাড়া টাকাটাও শোধ দিতে হবে।

লিচুর সমস্যা আমি কোনও দিনই ঠিক বুঝতে পারব না। ওর এক রকম, আমার লড়াই আর এক রকম।

পর দিন ভোরবেলা আমি গিয়ে পাগলা দাশুর জানালায় হানা দিই।

শুনেছেন লিচুদের হারমোনিয়ামটা বিক্রি হয়ে গেল?

শুনেছি।

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, মাত্র পঁচাত্তর টাকায়। আপনি কত ঠকে গিয়েছিলেন এবার ভেবে দেখুন।

পাগলা দাশু খুব অপ্রতিভ হেসে বলল, তা বটে। তবে দ্বিতীয়বার দামটা আরও বেশি পড়ে গেল আমার।

তার মানে?

ঘটনাটা ভারী মজার। কাল রাতে পশুপতি এসে হঠাৎ বলল, বলেছিলাম কি না পঁচাত্তর টাকাতেই দেবে! আমি অবাক হয়ে বললাম, কী! পশুপতি বলল, সেই যে লিচুদের হারমোনিয়ামটা! আপনি তো না-হক দুশো টাকা দিয়ে বাজারটাই খারাপ করে দিয়েছিলেন। সেই হারমোনিয়াম আজ আমি পচাত্তর টাকায় রফা করে নিয়ে এলাম। শুনে

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। লিচুরা হারমোনিয়ামটাকে বড় ভালবাসে। তাই আমি তখন পশুপতিকে বললাম হারমোনিয়ামটা আমি আবার কিনতে চাই। শুনে পশুপতি আকাশ থেকে পড়ে বলল, আবার! আমি বললাম, হ্যাঁ আবার! তখন পশুপতি মাথা চুলকে বলল, আপনার তো দেখছি হারমোনিয়ামটার জন্য বিস্তর খরচা পড়ে যাচ্ছে। আমি দর জিজ্ঞেস করায় পশুপতি খুব দুঃখের সঙ্গে বলল, আপনি কিনবেন জানলে কেনা-দামটা আপনাকে বলতাম না। তা কী আর করা যাবে, ওই দুশোই দেবেন, যা ওদের দিয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বলি, আবার কিনলেন?

আবার কিনলাম।

কিন্তু লিচুরা কিছুতেই ওই হারমোনিয়াম আপনার কাছ থেকে নেবে না।

জানি। তাই পশুপতিকে সেই ভার দিয়েছি। সে হারমোনিয়ামটা ওদের বাসায় দিয়ে বলে আসবে যে ওর বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না, জায়গা হলে হারমোনিয়াম নিয়ে যাবে।

আমি খুশি হতে পারলাম না কেন কে জানে। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, লিচুকে আপনি খুব ভালবাসেন?

বাসলে কি আপনার হিংসে হবে?

জানি না। আমি থমথমে মুখে বলি।

খুব হাসে পাগলা দাশু। বলে, খুব ভাল পার্ট করছেন আপনি। একদম আসলের মতো। ভীষণ হিংসুটে দেখাচ্ছে আপনাকে।

জবাব না দিয়ে চলে আসি। বুকের মধ্যে বার বার আক্রোশে হুল বিধিয়ে দিচ্ছে একটা কাকড়াবিছে, এমন জ্বালা।

পাগলা দাশু পিছন থেকে বলল, শুনুন। আমার সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। কাল কলকাতা যাচ্ছি।

ফটকের কাছ বরাবর এসে পড়েছিলাম। হঠাৎ এই বাঘাতে থমকে দাঁড়াই, তারপর পাথর বাধা দুই পা ঠেলে ঠেলে ফিরে আসি নিজের ঘরে।

কাঁদতে বড় সুখ। তাই বালিশে মুখ গুঁজে ভিতরকার পাগলা ঝোরা খুলে দিই।

১১. পাগলা দাশু

পাগলা দাশু

মেঘ ফুঁড়ে প্লেন নামছে। পায়ের নীচে বিশাল সেই শহর। এত উঁচু থেকেও তার বুঝি শেষ দেখা যায় না। আমি স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ে থাকি। ক্রমে শহরটা ছুটে চলে আসে আমাকে লক্ষ করে। তারপর আর দেখা যায়। না তাকে। খানিক বড় ঘাসের মাঠ জানালার বাইরে উলটোদিকে ছুটে যায়। ঝম করে দমদম এয়ারপোর্টের কংক্রিটে পা রাখল প্লেন। হু হু করে কলকাতা ঢুকে যাচ্ছে আমার মধ্যে। অত্যন্ত দ্রুত আমার মগজের মধ্যে জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়।

মনে পড়ে গেল। সব মনে পড়ে গেল! ভারী লজ্জা করছিল কলকাতার মুখোমুখি হতে। ভুলে গিয়ে অপরাধী হয়ে আছি। আড়ষ্ট লাগছে একটু। দীর্ঘ প্রবাসের পর ফেরার মতো।

.

সায়ন।

ডাক শুনে শ্যামলা রোগা, ছোটখাটো মেয়েটা পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা নিয়ন আলোর মতো জ্বলে উঠল না তো। তবে স্বাভাবিক খুশিই দেখাল ওকে।

বলল, তুমি! কত ভাবছিলাম তোমার কথা। কই চিঠিতে আসবে বলে লেখোনি তো!

হঠাং এলাম।

কেমন ছিলে? কেমন জায়গা?

সে অনেক কথা সায়ন। চলো, কলকাতাটা ঘুরে দেখি।

ঠিক আগের মতো আমরা ট্রামে, বাসে উঠে উঠে চলে যাই এখানে সেখানে। ময়দানে, পার্কে, গঙ্গার ধারে, রেস্টুরেন্টে, থিয়েটারে, সিনেমায়। কথা ফুরোতে চায় না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে পড়ে এ কথাটা ওকে বলা হল না। কাল বলব। পরদিন নতুন কথা মনে পড়ে।

আমাদের পুরনো ভাড়াটে বাড়িটার সেই শ্যাওলাধরা কলতলার আঁশটে গন্ধ বুক ভরে নিই। মায়ের আঁচলের গন্ধ নিয়ে রাখি। রাত জেগে আড্ডা দিই ভাইবোনেদের সঙ্গে।

চারদিনের দিন কাকভোরে জানালা দিয়ে সেই স্বর এল।

শুনছেন।

ফুলচোর। আমি মৃদু হেসে মুখ তুলি।

যাক, চিনতে পারলেন।

পারব না কেন?

চোখের আড়াল হলেই তো আপনি মানুষকে ভুলে যান। তবে এখন এই কলকাতায় কী করে মনে পড়ল আমাকে?

কী জানি। হয়তো আপনাকে ভুলতে চাই না।

কলকাতা কি ফিরে এল আপনার মনে?

এল।

সায়ন্তনী?

সেও।

তা হলে আমি বরং যাই।

শুনুন।

কী?

আমার আর একটা কথাও মনে পড়ছে যে।

কী কথা?

আপনাকে আমি আগে কোথায় দেখেছি।

পলকে মিলিয়ে গেল ফুলচোর।

ঘুম ভেঙে আমি হঠাৎ টানটান হয়ে বিছানায় উঠে বসি। মাথার ঘুমোনো কোনও বন্ধ ঘর থেকে ফুলচোরের জলজ্যান্ত স্মৃতি বেরিয়ে এসেছে। বেশি দিনের কথা তো নয়, মাত্র বছরখানেক।

পরদিনই শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করি। সব শুনে শঙ্কু খুব অপরাধী-হাসি হেসে বলে, সে সময়টায় মাথার ঠিক ছিল না। তোকে বলেই বলছি। ওই শহরে যখন আছিস, তখন সবই তো জানতে পারবি। কাটু আমার আপন পিসতুতো বোন।

কাটু! আমি ছ্যাকা খেয়ে চমকে উঠি। লিচুর মুখে কাটুর কথা শুনেছি না! অমিতদার ভাবী বউ।

শঙ্কু বিষণ্ন গলায় বলে, দোষটা আমারই। ও রাজি ছিল না।

তারা হোটেলে রাত কাটিয়েছিলি না সেদিন?

কাটিয়েছিলাম। কিন্তু কাটু নরম হয়নি। হলে আজ আমাদের ফ্যামিলিতে একটা বিরাট গণ্ডগোল হয়ে যেত। প্লিজ, এ ব্যাপারটা কাউকে বলিস না।

আমি মাথা নাড়লাম। বলব না।

.

সায়ন, আমাকে তোমার একটা ফোটো দেবে? আমি নিয়ে যাব।

ফোটো!–সায়ন্তনী একটু অবাক হয়ে বলে, ফোটো তো নেই। তোলানো হয়নি।

আমার যে দরকার।

সায়ন হাসে, তুমি এমন নতুন প্রেমিকের মতো করছ! ফোটো চাই তো আগে বলোনি কেন? তা হলে তুলিয়ে রাখতাম।

আমি ওর হাত ধরে টেনে নিতে নিতে বলি, চলো আজই দু'জনে ছবি তুলিয়ে রাখি।

সায়ন্তনী বাধা দেয় না, তবে বলে, আজ ফোটো তোলালে কি কাল দিতে পারবে? তুমি তো কালই চলে যাচ্ছ।

আমি ওর কথায় কান দিই না।

স্টুডিয়োয় ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে সায়ন্তনী আমার কানে কানে বলল, আমার ছবি ভাল ওঠে না।

ভালর দরকার নেই।

কেন চাইছ ছবি? শীতকালেই তো বিয়ে। আর কটা মাস।

হোক সায়ন। এই ক'টা মাসই হয়তো বিপজ্জনক।

কীসের বিপদ?

ফোটোগ্রাফার দৃঢ় স্বরে বলল, আঃ! কথা বলবেন না। আর একটু ক্লোজ হয়ে দাঁড়ান দু’ জনে।...আর একটু...নড়বেন না...রেডি...

সায়ন্তনী খুক করে হেসে ফেলে। ক্যামেরার একটা প্লেট নষ্ট হয়। ফোটোগ্রাফার রেগে যায়। আবার তোলে।

বেরিয়ে এসে সায়ন্তনী বলে, বাব্বা! ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে যা বুক ঢিবঢিপ করে।

কেন বুক ঢিবঢিব করে সায়ন?

কী জানি বাবা! মনে হয় একচোখে যন্ত্রটা আমার কী না জানি দেখে নিচ্ছে।

কী দেখবে! ক্যামেরাকে আমরা যা দেখাই তাই দ্যাখে। তার বেশি দ্যাখার সাধ্যই ওর নেই।

তবু ভয় করে।

মানুষের চোখ ক্যামেরার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পারে, মানুষের চোখকে ভয় পাও না?

তোমার সব উদ্ভট প্রশ্ন, জানি না যাও। শোনো, তুমি কেন বললে এই ক’টা মাসই বিপজ্জনক?

ও এমনি।

তা নয়। তুমি কিছু মিন করেছিলে।

আমি ওর হাত ধরে মৃদু ভাবে চেপে রাখি মুঠোয়। বলি, আমার সব কিছুই কেন অন্য রকম বলো তো।

কী রকম?

অন্য রকম। আমার জানালা দিয়ে পাহাড় দেখা যায়। সে ভীষণ উঁচু পাহাড়, অদ্ভুত তার রং। যেখানে ভয়ংকর জোরে বৃষ্টি নামে। গাছপালা ভীষণ ঝাঁঝালো।

সায়নী সামান্য রুক্ষ স্বরে বলে, ও জায়গাটা তো আর রূপকথার দেশ নয়। ওরকমভাবে বলছ কেন?

তা ঠিক। তবু আমার যেন কী রকম হয়।

কী হয়, বলবে?

আমার কিছুতেই কলকাতার কথা মনে পড়ে না। তোমার কথাও না।

তাই ফোটো তুলে নিলে?

হ্যাঁ।

সায়ন্তনী ম্লান মুখে হেসে বলল, জানলা দিয়ে পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না তো?

আর কী?

কোনও মহিলাকে?

যাঃ, কী যে বলো।

লোকে এমনি-এমনি তো ভুলে যায় না! পাহাড়, প্রকৃতি, বৃষ্টি এগুলো কি ভুলে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

না, তা হয়তো নয়।

তবে কী?

আমি ক্লিষ্ট হেসে বলি, বোধ হয় মাথায় সেই চোট হওয়ার পর থেকে আমার ব্রেনটা একটু ডিফেকটিভ হয়ে আছে সায়ন।

সায়ন্তনী ভ্রু কোঁচকায়। বলে, তোমার ব্রেন খারাপ হলে আমি সবচেয়ে আগে টের পেতাম। তোমার মাথায় কোনও দিন কোনও গোলমাল হয়নি।

তবে ভুলে যাচ্ছি কেন?

একদিন তুমিই তা বলতে পারবে।

তুমি পারো না?

না। সায়ন্তনী মাথা নাড়ে, আমি তোমার কী-ই বা জানি বলো? ওখানে গিয়ে তোমার কী হল তা এতদূর থেকে বলব কী করে? তবে মনে হচ্ছে তুমি ফিরে গিয়ে আবার আমাকে ভুলে যাবে।

না না–বলে আমি ওর হাত চেপে ধরি! তারপর শিথিল অবশ গলায় বলি, আমি তো ভুলতে চাইনা।

বলেই মনে হয়, মিথ্যে বললাম নাকি?

পরদিনই আমি দার্জিলিং মেল ধরি। সঙ্গে সদ্যতোলা সায়ন্তনীর ছবি। বারবার নিজেকে আমি বোঝাই, ভুলব না। এবার ভুলব না।

বাংকে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্রি ভেদ করে ট্রেন চলেছে। ভোর হবে এক আশ্চর্য সুন্দর অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি উপত্যকায়। শরৎকাল আসছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ উপুড় করে দেবে তার রোদ। সে ভারী সুন্দর জায়গা। আমি সেখানে যাচ্ছি।

কে যেন গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকল, শুনছেন?

উ!

আপনার জলের ফ্লাস্কটা একটু নেব? আমাদেরটায় জল নেই।

নিন না। ওই তো রয়েছে।

বলে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়তে থাকি। ঘুমচোখে অস্পষ্ট দেখতে পাই, আমার ফ্লাস্ক খুলে নীচের সিটে একটা বাচ্চা ছেলেকে চুকচুক করে জল খাওয়াচ্ছে তার মা, আর তার বাবা মুগ্ধ চোখে দৃশ্যটা দেখছে।

আহা, দৃশ্যটা বড় সুন্দর। দেখতে দেখতে আমি ঘুমে ঢলে পড়ি। কাল আমি আবার সেই মহান পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে পাব। অন্ধকারে হঠাৎ জাহাজের মতো ভেসে ওঠ ভোরের পাহাড়, ব্রোঞ্জের রং ধরে। ব্রোঞ্জ ক্রমে সোনা হয়।

কাকভোরে ফুলচোর আসবে ঠিক। ডাকবে, শুনছেন!

আপনার ঘড়িটা! ও মশাই!

আমি ঘুমের টিকিট আঁটা চোখ খুলে বলি, উ।

ঘড়িটা দিয়ে দিন।

আমি বাঁ হাতের ঘড়িটা খুলে লোকটার হাতে দিয়ে দিই। চোখ বুজেই দেখি, পাহাড়ের গায়ে সেই পাথরটায় বসে আছি। ঘন্টানাড়া একটা পাখি ডাকছে। ঝোরার শব্দ।

পেটে একটা খোঁচা লাগে। ককিয়ে উঠে আবার চোখ মেলি। প্রবল হাহাকারের শব্দ তুলে উন্মত্ত ট্রেন ছুটছে। প্রচণ্ড তার দুলুনি। মুখের সামনে আর একটা কাঠখোট্টা মুখ ঝুঁকে আছে।

আপনার মানিব্যাগটা?

হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগটা ঘুমন্ত হাতে বের করে দিয়ে দিই। তারপর ঘুমে তলিয়ে যাই আবার। ঘুমের মধ্যে লিচুদের হারমোনিয়ামটা প্যা-পোঁ করে বাজতে থাকে। বারবার বাজে। বেজে বেজে বলে, সখি ভালবাসা কারে কয়, সে কি শুধুই যাতনাময়...

কে যেন একটা লোক বিকট চেঁচিয়ে বলছে, শব্দ করলে জানে মেরে দেব! চোপ শালা! জানে মেরে দেব! কেউ শব্দ করবে না। জান নিয়ে নেব।

ফের আমাকে কে যেন ধাক্কা দেয়, আর কী আছে? ও মশাই আর কী আছে?

কে যেন কাকে একটা ঘুসি বা লাথি মারল পাশের কিউবিকলে। বাবা রে!’ বলে ককিয়ে উঠে। একটা লোক পড়ে যায়। তারপর ভয়ে বীভৎস রকমের বিকৃত গলায় বলে, মেরো না! মেরো না! দিচ্ছি।

আর একটা শব্দ করলে মাল ভরে দেব! চোপ শুয়োরের বাচ্চা।

একটা হাত আমার কোমর, পকেট, জামার নীচে হাতড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে চাইতেই মুখের সামনেকার হলুদ আলোটা কটকট করে চোখে লাগল।

কী চাই? আমি কাঠখোট্টা মুখটার দিকে তাকিয়ে বললাম।

আর কী আছে?

আমি চোখ বুজে বলি, কিছু নেই।

হয়তো আবার ঘুমের ঝোঁক এসেছিল। আবার কে যেন ডাকল, শুনছেন?

ফুলচোর। আমি মাথা তুলে শিয়রের জানলাটা দেখতে চেষ্টা করি।

শুনছেন! শুনছেন।-খুব চাপা জরুরি গলায় আমাকে ডাকছে কেউ। নীচের সিটে একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল।

শুনুন না। শুনছেন না কেন? বলতে বলতে কেঁদে ওঠেন একজন মহিলা।

আমি চোখ চাই।

কী হয়েছে?

সেই বাচ্চার মা মুখ তুলে চেয়ে আছে আমার দিকে। মুখে আতঙ্ক, চোখে জল।

ওরা আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। কী হবে?

কারা?– আমি বিরক্তির গলায় বলি।

ডাকাতরা। এতক্ষণ ধরে কী কাণ্ড করল টের পাননি? প্লিজ। কেউ কিছু বলছে না ওদের।

শুনতে শুনতেই আমি নেমে পড়তে থাকি বাংক থেকে।

আপনার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেল কেন?

বাচ্চার হাত থেকে বালা নিতে চেয়েছিল, আমার হাজব্যান্ড নিতে দিচ্ছিল না। ওই শুনুন।

বাথরুমের দিক থেকে একটা কান ফাটানো আওয়াজ আসে। বোধ হয় চড়ের আওয়াজ।

কামরার সব লোক চোখ চেয়ে স্ট্যাচুর মতো বসে আছে। নড়ছে না।

আমি বরাবর দেখেছি, আমি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই আমার শরীর তার কাজে নেমে পড়ে। এ দুইয়ের মধ্যে বোধ হয় একটা যোগাযোগের অভাব আছে।

বাথরুমের গলিতে অল্প আলোয় একটা লোককে গাড়ির দেয়ালে ঠেসে ধরে আছে চার মস্তান। হাতে ছোরা, রিভলভারও।

একবার দু’ বার মার খাওয়ার পর আর মারের ভয় থাকে না। আমার ভয় অবশ্য প্রথম থেকেই ছিল না। আমি বহুবার মার খেয়েছি। আমার মাথার একটা অংশ বোধ হয় আজও ফাঁকা।

আমি কিছু ভাবি না। পিছন থেকে চুল ধেরে দুটো লোককে সরিয়ে দিই তাঁচকা টান মেরে। রিভলবারওয়ালা ফিরে দাঁড়াতে না পাড়াতেই আমার লাথি জমে যায় তার পেটে।

কমিকসের বীরপুরুষরা একাই কত লোককে ঘায়েল করে দেয়। জেমস বন্ড আরও কত বিপজ্জনক ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। সিনেমার হিয়োরা অবিরল ক্লান্তিহীন মারপিট করে যেতে পারে।

হায়! আমি তাদের মতো নই।

তবু প্রথম ঝটকায় ভারী চমৎকার কাজ হয়ে যায়। একটা লোক বসে কোঁকাচ্ছে, বাকি তিনটে ভ্যাবাচ্যাকা। কিন্তু সেটা পলকের জন্য মাত্র।

আমি আর একবার হাত তুলেছিলাম। সে হাত কোথাও পৌঁছোয় না। একজন চাপা ভয়ংকর গলায় বলল, ছেড়ে দে। আমি দেখছি।

পিঠের দিক থেকে একটা ধাক্কা খাই। একবার, দু’বার।

ধাক্কাগুলো সাধারণ নয়। কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। পেটটা গুলিয়ে ওঠে। মাথাটা চক্কর মারতে থাকে।

কে যেন বলল, আর একটু ওপরে আর একবার চালা!

চালাল। তৃতীয়বার ছড়াৎ করে খানিকটা রক্ত ছিটকে আসে সামনের দিকে।

আমি মুখ তুলি। দেয়ালে ঠেস দেওয়া বাচ্চার বাবা আমার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে।

আমি তাকেই জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে আমার?

লোকটা হতভম্বের মতো মাথা নেড়ে জানাল, না।

আমি অবাক হই। কিছু হয়নি? তবে আমার দুটো হাতের আঙুল কেন কুঁকড়ে আসে? কেন উঠতে পারছি না? পায়ের কাছে কেন এক পুকুর রক্ত জমা হচ্ছে?

চারটে লোক সরে যায় দু'দিকে দরজার কাছে। উপুড় হয়ে আমি বসে আছি। কিন্তু বসে থাকতে পারছি না। বড় ঘুম। বমি পাচ্ছে। শরীরটা চমকে চমকে উঠছে।

পিছন থেকে বাচ্চার মা ডাকছে, চলে এসো! কী বোকার মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ ওখানে?

বাচ্চার বাবা চমকে ওঠে। তারপর সাবধানে রক্তের পুকুরটা ডিঙিয়ে বাচ্চার মায়ের কাছে যায়। তারপর তারা বোধ হয় ফিরে গেল তাদের বাচ্চাটার কাছে। যাবেই তো! বাচ্চাটা ভীষণ কাঁদছে।

ট্রেন হুইসিল দিচ্ছে বার বার। কুক বুক কু-উ। কুক কুক কুউ! থেমে আসছে গাড়ি। দু' দিকের দরজা খুলে যায়। চারটে লোক নেমে গেল।

আমার গলা দিয়ে ঘরর ঘরর করে একটা শব্দ হয়। জিভে সামান্য ফেনা। ধোঁয়াটে চোখেও আমি দেখতে পাই, মুখের ফেনার রং লাল।

হঠাৎ কামরায় তুমুল হট্টরোল ফেটে পড়ল। কারা চেঁচাচ্ছে, খুন! খুন! ডাকাত! বাঁচাও! খুবই ক্ষীণ শোনায় সেই শব্দ। আমার কানে ঝি ঝি ডাকছে। ঘন, তীব্র, একটানা।

কয়েকজন আমাকে তুলছে মেঝে থেকে। চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। লাভ নেই।

সায়ন!

তুমি আমার কেউ না।

আঃ সায়ন!

আমি তোমাকে ভুলে গেছি।

উঃ সায়ন।

ছবিটা ফেরত দেবে? আমাদের জোড়া ছবি কারও হাতে পড়লে কী ভাববে বলো তো! তুমি বেঁচে থাকলে এক কথা ছিল। তা যখন হচ্ছে না তখন কেন ওটা রাখবে? দাও নষ্ট করে ফেলি।

আমি ওর কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝতে পারি। ছবিটা বের করে ওর হাতে দিই। ও বসে বসে ছিঁড়তে থাকে।

লিচু।

ওঃ দারুণ মজা! দারুণ মজা!

কেন লিচু?

দেখুন, কত বার হাতবদল হয়ে আমাদের হারমোনিয়াম আবার আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।

খুশি ত লিচু?

ভীষণ। হারমোনিয়াম থাকলে আর কিছু চাই না। ঘর না, বর না, টাকা পয়সা না।

একদিন জ্যোৎস্নারাতে তুমি কিন্তু আমাকে চেয়েছিলে লিচু!

উঃ!–লিচু লজ্জায় মুখ ঢাকে। বলে, তা ঠিক। তবে গরিবরা সব সময়ই এটা চায়, ওটা চায়। না পেলেও দুঃখ হয় না আমাদের। আপনি কিছু ভাববেন না। হারমোনিয়াম আমাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

শিয়রের জানালায় ফুলচোর ডাক দেয়, শুনছেন!

ফুলচোর!

কলকাতায় কী হল?

সে অনেক কথা।

ম্লান মুখে বিষণ্ণ গলায় ফুলচোর বলল, আমাকে চিনতে পারলেন শেষমেষ?

না, ফুলচোর।

বললেন যে সেদিন।

ওটা মিথ্যে কথা। আপনি তো কোনওদিন কলকাতায় যাননি।

ফুলচোর জানালার গ্রিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে, আপনি সব জানেন, আপনি সব জানেন। এখন আমার কী হবে?

কিছু হবে না। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আমি কাউকে বলিনি। কোনওদিন বলব না। ভুলে যাব। দেখবেন।

ফুলচোর চোখের জল মুছে হাসে, আমি জানতাম, আপনি কখনও অত নিষ্ঠুর হতে পারেন না। আপনার মন বড় সুন্দর। লিচুদের হারমোনিয়ামটা নইলে আপনি কিনতেন না।

পশুপতিকে বলবেন লিচুদের হারমোনিয়ামটা যেন দিয়ে দেয়।

বলব।

এই জানলাটা এখন কি খুব ফাঁকা লাগবে আপনার?

ওমা! লাগবেনা? আমি তো রোজ আসি। যখন আপনি ছিলেন না তখনও। ফাঁকা জানলায় একা একা কত কথা কয়ে যাই।

ফাজিল।

ফুলচোর তাকায়। চোখে করুণ দৃষ্টি।

কোনওদিন বোঝেননি আপনি বলতে বলতে ফুলচোরের সুন্দর ঠোঁটজোড়া কেঁপে ওঠে।

কী বুঝব?

আমি বুঝি শুধু আপনার সেই আমাকে মনে পড়ার ভয়ে আসতাম?

তবে?

আমি আসতাম ফুল তুলতে। স্বাচ্ছন্নের মতো বলে ফুলচোর।

আমি চেয়ে থাকি। বুকের মধ্যে ডুগডুগির শব্দ।

ফুলচোর অকপটে চেয়ে থেকে বলে, একটা সাদা ফুল। ছোট্ট, সুন্দর।

ফাজিল।

দেবেন সেই ফুলটা আজ? দিন না!

ফুলচোর হাত বাড়ায়। গভীর গাঢ় স্বরে বলে, সাদা সুন্দর ফুলের মতো ওই হৃদয়। দেবেন?

আমি চোখ মেলি। হাসপাতালের ঘর নয়? তাই হবে। উপুড় করা রক্তের বোতল থেকে শিরায় ড্রিপ নেমে আসছে। নাকে নল।

একটা কালো ঢেউ আসে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলছে, গাড়ি বদল! গাড়ি বদল!

মাঝরাতে অন্ধকার এক জংশনে গাড়ি থেকে নামি। ঘোর অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওপাশে এক অন্ধকার ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠি। একা।

জানলার ধারে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে থাকি।

ট্রেন ছাড়ে। দুলে দুলে চলে। কোথায় যাচ্ছি তা প্রশ্ন করতে নেই। কেউ জবাব দেবে না।

তা ছাড়া কোথায় যাচ্ছি তা তো আমি জানি।

কিন্তু জানালায় তবু ফুলচোরের মুখ ভেসে আসে। করুণ, তীব্র এক স্বরে সে বলে, পৃথিবী আর সুন্দর থাকবে না যে। ফুল ফুটবে না আর! ভোর আসবে না। আপনি যাবেন না, আমাকে দয়া করুন।

আপনাকে দয়া, ফুলচোর? হাসালেন!

কেন যাচ্ছেন? কেন যাচ্ছেন? আমাদের কাছে থাকতে আপনার একটুও ইচ্ছে করে না?

আমি একটু হাসবার চেষ্টা করি। বলি, বড় মারে এরা। বড় ভুল বোঝে। প্রত্যাখ্যান করে। তার চেয়ে এই লম্বা ঘুমই ভাল। অনেক দিন ধরে আমি এই রকম ঘুমিয়ে পড়তে চাইছি ফুলচোর।

আমি যে রোজ একটা ফুলই তুলতে আসতাম তা কি জানেন?

জানি।

আজও সেই ফুল ভোলা হল না আমার। পৃথিবীতে তো সেই ফুল আর ফুটবে না কোনও দিন। প্লিজ!!

আমি ক্লান্ত বোধ করি। বলি, আপনি বাগদত্তা, ফুলচোর।

খুব জানেন। বোকা কোথাকার।

নন?

নই।

আর সায়ন?

পৃথিবীতে আর কেউ আমার মতো অপেক্ষা করছে না আপনার জন্য। শুধু আমি। শুধু একা আমি।

কেন ফুলচোর?

ওই সুন্দর সাদা ছোট্ট ফুল, ওটা আমার চাই।

আস্তে আস্তে গাড়ি থামে। পিছু হটে। আবার জংশন। আবার গাড়িবদল।

চোখের পাতায় হিমালয়ের ভার। তবু আমি আস্তে আস্তে চোখ মেলে চাই।